নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রথম সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৬০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রক—শ্রীতড়িৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ প্রেস

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আড়াই টাকা

শ্রীকানাইলাল সরকার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছ'মাস বাদে কাঁচড়াপাড়া টি বি হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরে এল জয়া। এসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার।'

অমিয় একটু হাসল, 'আমার চেহারা তো চিরকালই এই রকম, খালের জলে জোয়ার ভাঁটা বোঝা যায় না। যেখানে জোয়ার আসবার সেখানে কিন্তু এসে গেছে। দেখ একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে।'

দেওয়ালের আয়নার দিকে আঙুল বাড়াল অমিয়, জয়া না দেখি না দেখি করেও একবার না তাকিয়ে পারল না। ফর্সাপানা ভরন্ত মুখ, ভরন্ত যৌবনা চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে স্মিতমুখে কিন্তু বিস্মিত দুটি কালো চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এই কি সে? এ কি জয়ার নিজেরই প্রতিবিম্ব? বিশ্বাস করতে যেন ইচ্ছা হয় না। এত সুন্দর স্বাস্থ্য বিয়ের পরে তার আর হয়নি। বিয়ের শুধু এক আধ বছর আগে নয় আরো আরো আগের সেই ষোল সতেরর প্রথম যৌবন যেন ফিরে এসেছে। নিজেকে দেখতে এত ভালো লাগে। এত ভালো লাগে নিজের চোখ, মুখ, ঠোঁট, চিবুক। সত্যিই সে কি এত সুন্দরী। না এ তার নিজের দুটি চোখেরই শুধু পক্ষপাতিত্ব।

কিন্তু বেশিক্ষণ নিজের দিকে তাকাতে পারল না জয়া। পিছন থেকে আরো দুটি চোখ উঁকি মারছে। তাদের ছায়া পড়েছে আয়নায়। সে দুটি চোখও সুন্দর। তৃপ্তিতে, আত্মপ্রসাদে, স্নিগ্ধ কৌতুকে সুন্দর। কিন্তু সেই চোখের নীচে কণ্ঠার যে দুটি হাড় উঁচু হয়ে জেগে রয়েছে, তা তো সুন্দর নয়। সেই চোখা চোখা দুটি হাড় যেন খচ করে জয়ার বুকে গিয়ে বিঁধলো। জয়া আবার ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে, বলল, 'না, যাই বল, তোমার চেহারা ভারি খারাপ হয়ে গেছে।'

অমিয় এবারও একটু হাসল, 'যদি হয়েই থাকে, তোমার হাতের সেবাযত্নে আবার ভালো হয়ে উঠব। এতদিন তো মনোতোষের খবরদারিতে কেটেছে। ওর যা সাধ্য করেছে। এবার দেখা যাক, তুমি কোন্ অসাধ্য সাধন করো।'

মনোতোষ অমিয়ের দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই। জয়ার অসুখের শুরুতে অমিয়দের বাসায় এসেছিল চাকরির চেষ্টায়। কিছুকাল ঘোরাঘুরি করে যে চাকরি জুটিয়েছে সেও ঘোরাঘুরিরই চাকরি। অমিয়ই দিয়েছে জোগাড় করে। তার এক বন্ধুর আছে চায়ের ব্যবসা। সেই চা চালু করবার কাজ। সাইকেলে করে সারা শহর টহল দিতে হয়। নমুনা বিলি করে বেড়ায় চা-পায়ীদের বাড়ি বাড়ি। বলে, 'অন্তত দুদিন ব্যবহার করে দেখুন। এর নাম লাভিং পিকো। এমন চা আর হয় না।'

ভারি খাটুনির কাজ। মাইনে মাত্র পঁয়ত্রিশ। কিন্তু এর চেয়ে ভালো কাজ আর মনোতোষ কোথায় পাবে এই বাজারে। ক্লাস ফাইভ সিক্স্ পর্যন্ত বিদ্যা। বাইশ তেইশ বছর বয়স পর্যন্ত গাঁয়ের বাড়িতে কাকার সংসারে বসে বসে খেয়েছে। আর সুযোগ পেলেই তাঁর সাইকেল চুরি করে নিয়ে বেরিয়েছে টো টো করতে। কাকা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। সাইকেলটি তাঁর একমাত্র বাহন। একদিন দূরের এক জরুরী কলে না যেতে পেরে কষে চড় লাগালেন ভাইপোর সযত্নে শেভ করা গালে। 'হারামজাদা, তুই আমার খাবি আমার ব্যবসাই নষ্ট করবি। এত করে বলছি কম্পাউণ্ডারিটা শেখ। তা সে দিকে খেয়াল নেই, কেবল লক্ষ্য কখন সাইকেল নিয়ে পালাবি। যা দূর হয়ে যা, এখানে আর তোর ভাত নেই।'

অবশ্য ভাত খুব কষ্টেই জুটছিল। কখনো ফেনা কখনো পান্তা। কাকার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। হোমিওপ্যাথির ভাগ্য সন্তানভাগ্যের

সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না। দেড় বছর অন্তর অন্তর কাকীমা আঁতুড় ঘরে যান আর দ্বিগুণ খিটখিটে মেজাজ নিয়ে বেরোন। কাকার সংসারে ভাত খুব সুখের ছিল না মনোতোষের। তবু কোন রকমে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ছোট ছোট খুড়তুতো ভাইবোনদের সামনে এই বুড়ো বয়সে চড় খেয়ে মনোতোষের মনেও ধিক্কার এল। সেই দিন রাত্রেই কলকাতার গাড়িতে চেপে পড়ল। অখিল মিস্ত্রী লেনে অমিয়দার বাসাটা আগেই চেনা ছিল। এক জামা-কাপড়ে সেখানে এসে হাজির হয়ে দাদা আর বউদির পায়ের ধুলো নিয়ে মনোতোষ বলল, 'এবার কিন্তু আমি আর যেতে আসিনি অমিয়দা। এখানেই থাকব।'

তার কিছুদিন আগেই জয়ার রোগটা ধরা পড়েছে। রঞ্জনরশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছে শ্বাসযন্ত্রের বৈকল্য।

অমিয় গম্ভীর মুখে বলল, 'বেশ তো থাকো।'

মনোতোষ তেমন সাদর অভ্যর্থনা না পেয়ে একটু দমে গিয়ে বলল, 'বসে বসে আর কারো ঘাড়ে খাব না অমিয়দা। কাজকর্ম করেই খাব। কিন্তু ভালো দেখে কাজ একটা আপনাকেই জুটিয়ে দিতে হবে।'

জয়া একটু হেসে বলেছিল, 'তা দেওয়া যাবে। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন। আজ রাত্রেই চাকরি চাই নাকি আপনার।'

মনোতোষ বলেছিল, 'চাইলেই বা পাব কোথায়। কিন্তু আপনি আর আমাকে আপনি আপনি করবেন না। বয়স বিদ্যেবুদ্ধি সবতাতেই আমি ছোট।'

জয়া হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা আচ্ছা আর বিনয় করতে হবে না।'

যত নম্রতা মুখেই মনোতোষের। মাথাটা মোটেই নোয়ানো নয়। বেশ খাড়া। অমিয়ের চাইতে ইঞ্চি দুই আড়াই বেশি লম্বা; দেখতে তেমন সুপুরুষ না হলেও বেশ শক্ত মজবুত গড়ন। ফর্সা রঙ। মাথায় কালো কোঁকড়ানো চুলগুলি বেশ মানিয়েছে। ওর দেহের দিকে

তাকিয়েই কেউ হয়তো মনোতোষ নামটা রেখেছিল। কিন্তু প্রথম দিন ওকে দেখে মন তুষ্ট, চোখ তৃপ্ত হওয়ার বদলে কেমন এক ধরণের দুঃখই হয়েছিল জয়ার। আহা, এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা। লেখাপড়া শিখল না, শেখার সুযোগ পেল না, সারাজীবন আকাট মূর্খ হয়েই ওকে থাকতে হবে।

জয়া স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও বুঝি এখনো ফেরেনি।'

অমিয় বলল, 'এর অনেক পরে ফেরে। ফিরে উনানে আঁচ দেয়, চা করে। রান্না-বান্নার জোগাড় শুরু করে দেয়। কোন রকম কোন ক্লান্তি নেই।'

জয়া বলল, 'তা তো বুঝলুম। কিন্তু ভাইয়ের কাছ থেকে এত আদর যত্ন পেয়েও চেহারা অমন হয়েছে কেন তা বললে না তো।'

তরল আর উচ্ছল শোনাল জয়ার গলা।

অমিয় বলল, 'কেন হয়েছে তা বোঝ না? এতদিন আর কোন দিকে তাকাবার কি জো ছিল, না সাধ্য ছিল?'

জয়া এবার লজ্জিত হোল। তা ঠিক। একমাত্র স্ত্রীর কথা ভাবা ছাড়া তার চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করা ছাড়া আর কোন দিকে খেয়াল ছিল না অমিয়র। জয়ার রাজব্যাধির রাজকর যোগাতে সব শক্তি সম্পদ, সামর্থ্য নিয়োগ করতে হয়েছিল ওকে। নিজের শ্রী, স্বাস্থ্য, খাওয়াপরা কোন কিছুর দিকে তাকাতে সময় পায়নি, মন যায়নি। তাকাতে গেলে স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যের টাকার টান পড়বে যে।

জয়া এগিয়ে এসে স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার পর কোমল মিষ্টি গলায় বলল, 'সাধ্য কি করে থাকবে। আর তো কোন দিকে তোমার লক্ষ্য ছিল না। সমস্ত মন সেই কাঁচড়াপাড়ার হাসপাতালে পড়ে ছিল। এবার কিন্তু নিজের শরীরের দিকে তাকাও। স্বাস্থ্য ভালো

কর। তোমার স্বাস্থ্য ভালো না হলে আমার স্বাস্থ্য ভালো হওয়ার কোন মানে হয় না, বুঝেছ?'

অমিয় একটু হেসে বলল, 'বুঝেছি।'

জয়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা আমি বুঝি তাই বলছিলাম?' লজ্জাটা এড়াবার জন্যেই যেন অন্য কথা পাড়ল জয়া—বলল, 'কই মঞ্জুকে আনলে না? ও কেমন আছে?'

অমিয় বলল, 'এতক্ষণে বুঝি মঞ্জুর কথা মনে পড়ল তোমার? এই বুঝি মাতৃহৃদয়?'

জয়া বলল, 'হৃদয়টা তো আর মায়েরা মুখে মুখে করে বয়ে বেড়ায় না? সেটা যেখানে রাখবার সেখানেই রাখে। ও বুঝি এল না? না মা-ই ছাড়ল না ওকে?'

তিন বছরের মেয়ে মঞ্জু। বছর খানেক আগে জয়ার অসুখের সূচনাতেই তাকে টালীগঞ্জে শাশুড়ীর কাছে রেখে এসেছিল অমিয়। দিদিমার আদর আহ্লাদে সে মেয়ে এমনই ভুলেছে যে, বাপ-মার কাছে বড় একটা আসতে চায় না, আনতে গেলে কাঁদে।

জয়া বলল, 'ভারি অকৃতজ্ঞ হয়েছে তো মেয়েটা।'

অমিয় হাসল, 'কেবল কি অকৃতজ্ঞ? রীতিমত বিশ্বাসঘাতিনী। মোটেই মায়ের স্বভাব পায় নি।'

ঘর-দোর সব এলো-মেলো হয়ে আছে। পুরুষের হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে গেলে তার কি শ্রী থাকে না চেহারা থাকে। নিজেদের থাকবার ঘরটা মোটামুটি গুছিয়ে তুলতে হাত লাগাল জয়া। এক রাশ বই, মাসিক কাগজ ঘর ভরে ছড়ানো। তক্তপোষের ওপর ময়লা বিছানা। আলনায় ছেঁড়া ছেঁড়া কতকগুলি আধময়লা জামা। তক্তপোষের তলায় এক জোড়া পুরোন জুতো। প্রত্যেক পাটিতে দুটো করে তালি। গোড়ালির কাছে ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ আর এক জোড়া স্যাণ্ডাল।

ঝাড়ুনি হাতে সেগুলিকে টেনে বার করতে করতে জয়া বলল, 'এগুলি জড়ো ক'রে রেখেছ যে।'

অমিয় বলল, 'কি করব বল। ওরা যদি মায়া কাটাতে না চায়— ।'

জয়া বলল, 'না চায় তো আমি মায়া কাটাব। এক্ষুনি এগুলি দূর করে ফেলে দিচ্ছি। কালই তুমি নতুন জামা আর জুতো কিনে নেবে।'

অমিয় চুপ করে রইল। স্ত্রীর হুকুমই হোক, অনুরোধই হোক, রক্ষা করা তার পক্ষে সহজ নয়। তা জয়া নিজেও জানে।

হুকুম দিয়ে চুপ করে রইল জয়াও। একটু বাদে বলল, 'কত দেনা হয়েছে ?'

অমিয় বলল, 'এত তাড়া কিসের। যাক না ক'দিন। তারপর ধীরে সুস্থে সব হিসেব করা যাবে। বাজারে যত দেনাই থাকুক আমার বড় পাওনা তো আমি পেয়ে গেছি। এখন আমার জমার ঘরই ভারি। আজ বলি, তোমাকে যে ফিরিয়ে আনতে পারব এমন আর আশা ছিল না জয়া।'

'না আশা ছিল কিসের। তুমি বড় অল্পেই ঘাবড়ে যাও। তারপর দুটো চাকরিই করছ তো এখনো ? যুগবাণী আর ভারত পাবলিশার্স দুটোতেই আছ, না ?'

অমিয় একটু থামল, 'না থাকলে চলবে কি করে ?'

অবশ্য থেকেও যে খুব ভালো চলছে তা নয়। ভারত পাবলিশার্স থেকে মাইনে খুব বেশি মেলে না। যুগবাণী পত্রিকায় আরও কম। কাগজটা নিজেদের রাজনৈতিক দলের। বিজ্ঞাপন যেমন জোটে না, কাটতিও তেমনি। চাঁদার টাকাই ভরসা। তবু ওরা অমিয়র সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবেচনাই করে। যুগবাণীতে স্থায়ীভাবে রাত্রের সিফট ঠিক করে নিয়েছে অমিয়। দিনে কাজ করে ভারত পাবলিশার্স'এ।

ম্যানাস্ক্রিপটগুলি দেখেশুনে দেয়। প্রুফও দেখতে হয় মাঝে মাঝে। শুধু তাই নয়। আর একটি তৃতীয় ফ্রন্টও আছে। ফাঁকে ফাঁকে ফুরণে স্কুলের পাঠ্য বই লেখে অমিয়, লেখে নোট বই। নিজের নাম থাকে না। প্রকাশকেরা নামজাদাদের নামেই সেগুলি কাটায়। ফর্মা পিছু কিছু দেয় অমিয়কে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে সব খবরই রেখেছে জয়া। কিন্তু শুধু খবরই রেখেছে আর কিছু করতে পারেনি।

একটুকাল চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'এবার আমার জন্যে একটা চাকরি বাকরি ঠিক করে দাও।'

অমিয় একটু হেসে বলল, 'হুঁ', তাই তো, তার মানে হাসপাতালের আর একটা বেড ঠিক করে রাখ আমার জন্যে। যাক কিছুদিন। এক্ষুণি তোমাকে চাকরির জন্যে ভাবতে হবে না। বেশি বেশি ভাবতে গিয়েই তো এই দশা।'

কথাটি অসত্য নয়। মঞ্জু হবার ঠিক পর থেকেই বড় বেশি পরিশ্রম শুরু করেছিল জয়া। চাকরি নিয়েছিল এক মার্চেন্ট অফিসে। দশটার আগে গিয়ে পৌঁছতে হোত। বেরুতে বেরুতে ছটা। টাইপ করতে করতে আঙুল আসত অসাড় হয়ে। ঘরকন্নার কাজেরও বিশ্রাম ছিল না। নিজেদের দলের ওপর কর্তব্য বোধও ছিল চড়া। চাঁদা আদায়, সভা সমিতির উদ্যোগ আয়োজন যখন যে রকম ফরমায়েস আসত জয়া এগিয়ে যেত। বিনা ফরমায়েসে বিনা ডাকেও এগুত। কেউ যেন না বলতে পারে জয়া ঘরের কাজে দলের কাজ ভুলেছে। দল তো দল নয়। দল হোল দেশ। ঘরের সঙ্গে বাইরের যোগসূত্র। কিন্তু আদর্শের এত চড়া সুর শরীর সইতে পারল না। দেহযন্ত্র ক্রমেই বেসুরো বাজতে লাগল। ডাক্তার ডাকল অমিয়। তিনি পাঠালেন আরও বড় ডাক্তারের কাছে। বড় ডাক্তার বললেন, 'তা বড়

দেরি করে এসেছেন। এবার যত তাড়াতাড়ি পারেন ভালো হাসপাতালে একটা বেডের ব্যবস্থা করুন। মোটেই দেরি করবেন না।'

ডাক্তার বলেছিলেন এক দিনও দেরি সইবে না। তবু মাস ছয়েক দেরি করতেই হোল। বেড আর জোটে না। কত সুপারিশ কত ধরাধরি। শেষ পর্যন্ত জায়গা পাওয়া গেল কাঁচড়াপাড়ায়। ফ্রী বেড মিলল না, পেয়িং ওয়ার্ডেই থাকতে হোল শেষ পর্যন্ত। এই দিনগুলি যে অমিয়ের কিভাবে কেটেছে তা জয়ার অনুমান না করতে পারার কথা নয়। উদয়াস্ত খেটেছে অমিয়। যখন নিজের রোজগারের টাকায় কুলোয়নি ধারের জন্যে ছুটোছুটি করেছে শহর ভরে। রোগের রাজস্ব দিতে অমিয়র ঘড়ি গেছে, আংটি গেছে, জয়ার খালি হয়েছে গয়নার বাক্স। তবু ফিরে তো এসেছে। তবু তো দু হাত দিয়ে ঠেলে রাখতে পেরেছে অকাল মরণকে। সেই হাত দু'খানা জয়ার নয়। বিজয়ীর সেই দৃঢ় বাহু অমিয়র, তার স্বামীর।

হাসপাতালে বিছানার পাশে টুলের ওপর বসে বেদানার দানা ছাড়িয়ে একটি একটি করে স্ত্রীর মুখে তুলে দিতে দিতে অমিয় কতদিন বলেছে, 'হতাশ হয়ো না জয়া।'

জয়া জবাব দিয়েছে, 'হতাশ হব কেন। আর কিছুর জন্যে নয়, আর কারো জন্যে নয়, নিজের জন্যেও নয়, শুধু তোমার জন্যেই আমি বাঁচব। আমাকে বাঁচতেই হবে। তোমার এই কষ্ট আমি বৃথা যেতে দেব না।'

অমিয় বলেছে, 'বেশ তো। আমার জন্যেই তুমি সেরে ওঠো, বেঁচে ওঠো।'

স্ত্রীর হাত নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে সস্নেহে একটু চাপ দিয়েছে অমিয়। তার সেই একটু স্পর্শের মধ্যে স্বামীর প্রগাঢ় অনুরাগের স্বাদ নিতে নিতে রোগশয্যাতেও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে জয়া। এ যেন নতুন করে আত্মসমর্পণের আনন্দ।

বছরচারেক আগে আত্মসমর্পণ খুব সহজ হয়নি। দলের শিল্প সাহিত্য বিভাগে দিনের পর দিন এক সঙ্গে কাজ করতে করতে যখন দুজন কাছাকাছি হোল প্রয়োজন বোধ করল আরো কাছাকাছি আসবার, জয়ার বাবা-মা বাধা দিলেন। দুজনের জাতের মিল নেই। জয়ারা বামুন। অমিয় মাহিষ্য।

মা বললেন, 'বামুনের মেয়ের সঙ্গে মাহিষ্যের বিয়ে? তোরা কি জাত জন্ম কিছুই রাখবিনে জয়া?'

জয়ার বাবাও বাধা দিলেন, 'এ হ'তে পারে না। কিছুতেই হ'তে পারে না।'

জয়া বলল, 'কেন হ'তে পারেনা বাবা। তুমি না কংগ্রেসী, তুমি না গান্ধীজীর ভক্ত? তিনি কি জাত মানতেন?'

জয়ার বাবা বললেন, 'জাতের কথা নয়। কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা রুচি সামাজিক আদব কায়দা কোন্ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে অমিয়দের মিল আছে শুনি? ওদের পরিবারের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে তুই মিলে মিশে থাকতে পারবি? রাজনীতির মিলটাই একমাত্র মিল নয়। তুই ভালো ক'রে ভেবে দেখ।'

দু'বছর ধরে ভেবে দেখেছে জয়া। কিন্তু সব ভাবনা সব যুক্তিতর্কই এক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছে। অমিয়কে বলল, 'আমি তো আর পারিনে। কি করি বল।'

অমিয় বলল, 'আমি কিছু বলব না। তোমার নিজের ইচ্ছের ওপর সব নির্ভর করে।'

জয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'কেবল আমার ইচ্ছে? তোমার ইচ্ছের কি কোন জোর নেই? তুমি কি মুখ ফুটে বলতে পারো না 'তুমি এসো?' তুমি কি জোর করে হাত ধরে টেনে নিয়ে তুলতে পারো না তোমার ঘরে?'

অমিয় বলল, 'তা না-ই বা তুললাম। হাতের জোরের পরীক্ষা অনেকের ওপর দিয়ে করেছি। তোমার ওপর দিয়ে তা না-ই বা করলাম জয়া। আমার মধ্যে সত্যিই যদি কোন জোর থাকে তুমি নিজেই উঠে আসবে আমার ঘরে। ঘর আমি তুলে রেখেছি, দোর আমি খুলে রেখেছি। তুমি এখন এলেই হয়। আমি গান্ধর্ব বিয়েকে মানি, কিন্তু আসুরিক বিয়েতে আমার রুচি নেই।'

শেষ পর্যন্ত অমিয়র রুচিই জয়ী হোল। তাদের গান্ধর্ব বিয়ের পুরোহিত হলেন ম্যারেজ রেজিস্টার। প্রথম কিছুদিন অমিয়দের গাঁয়ের বাড়িতে কাটিয়ে এল জয়া। বৃদ্ধা নিরক্ষরা শাশুড়ীর সঙ্গে সংসার করতে করতে বার বার করে বাবার কথা তার মনে পড়তে লাগল। বেশ বুঝতে পারল এভাবে কাটবে না, এভাবে কাটবে না। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে শাশুড়ী সংসারের মায়া কাটিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গেলেন।

কলকাতায় বাসা বাঁধল অমিয়। খুব ভালো বাসা নয়। মধ্য কলকাতায় ঘিঞ্জি গলির পুরোন একতলা বাড়িতে পাশাপাশি দু'খানা ঘর। দেড়খানা বললেই ভালো হয়। ভাড়া চল্লিশ টাকা।

অমিয় বলল, 'আপাততঃ এতেই খুশি থাকতে হবে জয়া। এর চেয়ে বেশি ভালো বাড়ি আর পাওয়া গেল না'

জয়া বলল, 'না গেল। যা পেয়েছি তাই ঢের। এই আমার স্বর্গ।'

স্বর্গ ছিল না। কিন্তু দু-তিন দিনের মধ্যেই ঘর দু'খানাকে স্বর্গ করে তুলল জয়া। দেয়ালগুলিতে নতুন করে কলি করাল। ঝেড়ে পুছে ধুয়ে ঝকঝকে করে তুলল মেঝ। পুরোন বাজার ঘুরে ঘুরে সস্তা দামে কিনল একটা টেবিল, বইয়ের র‍্যাক আর দু-তিনখানা চেয়ার। পরের মাসে কিনল একখানা তক্তপোষ, চায়ের সরঞ্জাম, দুটি ফুলদানী। জানালা দরজায় ঝুলল রঙীন পর্দা। দেখতে দেখতে চেহারা ফিরে গেল ঘরের।

'কিন্তু একটা পর্দাও যে নেই। সবই কি ছিঁড়ে গেছে?' ঘর গুছাতে গুছাতে ঘাড় ফিরিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে গেল জয়া। কিন্তু কোথায় অমিয়? যেখানে সে বসেছিল সেখান থেকে কখন যে উঠে গেছে জয়া টেরও পায়নি। অমিয়র বদলে দেখা গেল মনোতোষকে। সবে অফিস থেকে ফিরেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো খুলছে।

জয়াকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে উঠল মনোতোষ, বলল, 'রাস্তায় আমিয়দার সঙ্গে দেখা। তার কাছেই শুনলুম তুমি এসেছ বউদি। বাঃ ভারি সুন্দর চেহারা হয়েছে তোমার।'

জয়া একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা। কেবল আমার দিকে চোখ দিচ্ছ কেন? তোমার নিজের স্বাস্থ্যও তো বেশ ভালো হয়েছে।'

মনোতোষ খুশি হয়ে বলল, 'ভালো হয়েছে? আরো ভালো হোত বউদি কিন্তু চা কোম্পানী খাটিয়ে খাটিয়ে একেবারে মেরে ফেলল। সাইকেল থেকে এক মিনিটের জন্যেও একটু নামবার জো নেই। কেবল হুকুম, কেবল হুকুম! এই সাইকেলকে কত ভালোই না বাসতাম বউদি, ফাঁক পেলেই কাকার সাইকেল নিয়ে সরে পড়তাম। জানোই তো তা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি কেলেঙ্কারি! আর এখন মজা দেখ। সেই সাইকেল এমন ক'রেই ঘাড়ে চেপেছে। ওকি তুমি কয়লা ভাঙতে বসলে যে। সব আমি করব। তোমার কিছু করতে হবে না। দাঁড়াও জামাটা ছেড়ে আসি।'

জয়া বলল, 'এখন আর এসব তোমার করতে হবে কেন। এখন তো আমি এসেই গেছি'।

মনোতোষ বলল, 'এসে গেছ বলেই বুঝি সব একদিনে শুরু করতে হবে। এত বড় একটা তালগাছের মত চেহারা নিয়ে আমি আছি কি করতে?'

জয়া হেসে বলল, 'তুমি তো আছই। ভালো কথা তোমার দাদা গেল কোথায়। চা টা না খেয়েই বেরুল না কি। দেখ একবার বলেও গেল না যে বেরুচ্ছি।'

মনোতোষ বলল, 'অমিয়দার কথা আর বলোনা, তার ওইরকমই কাণ্ড। এই ক'মাস কি একা একা তাকে নিয়ে কম ভুগেছি। এবার তুমি এসেছ। তবু দু'জনে মিলে ভোগা যাবে।'

অফিসের সার্ট আর ট্রাউজার ছেড়ে রঙীন একখানা লুঙ্গি পরে কয়লার কাছে এসে বসল মনোতোষ। জোর করে হাতুড়ীটা জয়ার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, 'অন্য কাজ-কর্ম কিছু থাকে তাই কর গিয়ে যাও। এসব আমি দেখছি।'

জয়া সব একেবারে মনোতোষের হাতে ছেড়ে দিল না। মনোতোষও ছাড়বে না সহজে। বলল, 'তুমি এই কেবল হাসপাতাল থেকে ফিরলে। দাদা এসে এখনই তোমাকে কাজ করতে দেখলে বলবে কি, আমাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে না?'

কাজ নিয়ে প্রথমে কাড়াকাড়ি চলল কিছুক্ষণ। তারপর দু'জনের সহযোগিতায় শুরু হোল রান্নার আয়োজন।

খানিক বাদেই অমিয় ফিরে এল, বলল, 'প্রেসে গিয়েছিলাম একটা জরুরী কাজে। ভালো করে রাঁধো বাড়ৃ। পেট ভরে দুটি খাই। তারপর ধীরে সুস্থে গড়াতে গড়াতে রাত এগারটায় গিয়ে অফিসে হাজির হব আজ।'

জয়া অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কি আজও রাত্রে যাবে না কি অফিসে? একটা দিন ছুটি নিতে পারবে না? না হয় কামাইই করলে।'

অমিয় বলল, 'তা'হলে আর কাগজ বেরোবে না। একেই তো লোকজন কম। আচ্ছা কাল অফ নেওয়ার বন্দোবস্ত করব। বোঝোতো

আগে থেকে ব্যবস্থা না ক'রে এলে সকলেরই অসুবিধে হয়। আর এতো মালিকের কাগজ নয় যে হেলা-ফেলা করব। দলের কাগজ। এর কোন ক্ষতি কি তোমারই সইবে?'

জয়া একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আচ্ছা যাও।'

অমিয় বলল, 'ভেব না। ঠিক আড়াইটে তিনটেয় বাসায় চলে আসব আবার। আজ কত ফুর্তিতে কাজ করতে পারব তা জানো? আজ তো আর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই মনে। আজ তোমার কথা ভাবব আর লিখব।'

জয়া হেসে বলল, 'দেখ, যেন কবিতা লিখে ফেল না।

অমিয়ও হাসল, 'আজ তাও লিখতে পারি। বিচিত্র কিছু নেই।'

রাত দশটার সময় স্ত্রীকে ওপর ওপর আর একটু আদর করে বিদায় নিল অমিয়।

শুতে যাওয়ার আগে মনোতোষ বলল, 'অমিয়দার কোন যদি আক্কেল পছন্দ থাকে। আজ তাকে যেতে দিলে কেন বউদি।'

জয়া বলল, 'সে তুমি বুঝবে না। যাও, ঘরে যাও মনোতোষ।' বলে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল জয়া।

তক্তপোষে বহুদিন পরে নিজের হাতে যত্ন ক'রে বিছানা পেতেছে। পাশাপাশি দুই জোড়া বালিশ সাজানো। বালিশের ওপর ফুল তোলা দু'খানা ঢাকনি। ট্রাঙ্কের ভিতর থেকে আজ খুঁজে পেতে বের করেছে জয়া।

এক পাশে শুয়ে পড়তে পড়তে খুব আস্তে একটা নিঃশ্বাস চাপল জয়া। খবরদার এ নিঃশ্বাস যেন নিজের কানেও না যায়। তা'হলে লজ্জায় জয়া নিজেই মরে যাবে।

তার চেয়ে ভাবা যাক অমিয়র নিষ্ঠার কথা। তার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা অধ্যবসায়ের কথা। আগামী কালের স্বপ্ন তার চোখে। সে স্বপ্নকে

বাস্তব ক'রে তুলতে হবে। সে কালকে নিজেদের হাতে এগিয়ে আনতে হবে। বদলে দিতে হবে পৃথিবীর রূপ, মানুষের চেহারা। সে পরিবর্তন তো সহজে আসবে না। তার জন্যে অনেক ত্যাগের প্রয়োজন। দরকার অনেক আত্মোৎসর্গের। জয়া তো শুধু অমিয়র ঘরের ঘরণী নয়, তার পথেরও সঙ্গিনী।

অমিয়র এই নিষ্ঠাই জয়াকে বেশি ক'রে টেনেছে। ওর অনেক মতের সঙ্গে অনেক কথার সঙ্গেই জয়ার মন সায় দেয় না। মাঝে মাঝে অমিয়কে মনে হয় বড় অসহিষ্ণু বড় উদ্ধত, প্রতিপক্ষকে ও ক্ষমা করে না। কারো কারো কাছে কটুভাষী বলেও ওর দুর্ণাম আছে। জয়া মাঝে মাঝে যখন তা নিয়ে কটাক্ষ করে তখন অমিয়র মন নরম হয়। লজ্জিত হয়ে বলে, 'সত্যি, মাঝে মাঝে আমি সংযম হারিয়ে ফেলি জয়া। যখন ভাবি পলে পলে আমরা কত হারাচ্ছি, চোখের ওপর কত অপচয় দেখছি মানুষের, তখন আমার আর কিছু খেয়াল থাকে না।'

নিজের বাবার শিক্ষা মনে পড়ে জয়ার, বলে, 'কিন্তু সত্যিকারের যে কর্মী তার তো ধৈর্য হারালে চলবে না অমিয়। ধৈর্য হারালে তাকে সব হারাতে হবে। সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় তোমরা যখন বাক্-সংযম হারিয়ে ফেল। যেমন কলমে তেমনি মুখে। তোমরা ভাব অকথ্য গালাগালের ভাষাটাই জনসাধারণের একমাত্র ভাষা। আর তোমরা তাদের মুখপাত্র।'

অমিয় বলে, 'দোষ আমাদের আছে। কিন্তু ভাষা তো শুধু মুখেরই নয়। তার মুল আরো গভীরে। পেটের নাড়ী যখন ক্ষিদেয় জ্বলে, অন্তর যখন জ্বলতে থাকে অনাচারে-অবিচারে, তখন মুখ থেকে যদি খুব মিষ্টি ভাষা না বেরোয়—'

জয়া বাধা দিয়ে বলে, 'মিষ্টি না হোক ভদ্র হবে। সে ভাষা শিষ্টাচারের ব্যাকরণ মেনে চলবে।'

অমিয় তবু তর্ক করে, 'সব সময়েই কি আর তা চলে জয়া। ওঝা যখন সাপের বিষ নামায় সে ভাষা শুনেছ? চাষা মজুর যখন ঘা খেয়ে বাপান্ত করে, সে ভাষা শুনেছ?'

জয়া বলে 'শুনেছি। কিন্তু তুমি তো সত্যি সত্যি চাষীও নও, মজুরও নও। শিক্ষায় নয়, দীক্ষায় নয়, আহারে বিহারে বেশে ভূষায় নয়, কোন দিক থেকেই তুমি declassed হ'তে পারোনি। শুধু বুঝি এক ভাষার বেলাতেই চাষা বন্‌বে? আমি তোমার ওঝার ভূত নামানো মন্ত্রে বিশ্বাসী নই। তার চেয়ে বাবার সংস্কৃত মন্ত্র আমার প্রিয়। তুমি বলতে পারো যে মন্ত্র বুর্জোয়ার সে মন্ত্র মৃত; বেশ নতুন ভাষা সৃষ্টি কর। কিন্তু সে ভাষা যেন দীন না হয়, দরিদ্র না হয়। শুধু কয়েকটা 'মেহনতী' বুলি কাগজ ভরে ছড়িয়ে দিলেই তোমাদের সব মেহনৎ সার্থক হবে ভেব না।'

অমিয় বলে, 'তোমার কথা ভেবে দেখব।'

শুয়ে শুয়ে স্বামীর কথা ভাবতে লাগল জয়া। ভাবতে লাগল এই ক' মাস কি উদ্বেগ অশান্তি, কি অস্বস্তির মধ্যেই না তাকে দিন কাটাতে হয়েছে। আজ সত্যিই একটু নিশ্চিন্তভাবে হয়তো কাজ করতে পারবে।

পরদিন বেলা আটটার সময় ফিরে এল অমিয়। সঙ্গে ডাক্তার বন্ধু নির্মল দত্ত। অমিয় বলল, 'ওকে চা খাওয়াবার জন্যে ডেকে আনলাম জয়া। আজ আর ওকে রোগী দেখতে হবে না।'

নির্মল একটু হাসল, 'সত্যি, তুমি খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠেছ কিন্তু।'

জয়া বলল, 'তোমার বুঝি খুব আফসোস হচ্ছে।'

নির্মল বলল, 'ভয়ঙ্কর আফসোস। এমন একটি রোগী হাতছাড়া হয়ে গেল।'

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল। নির্মলের

নিজের অবস্থা ভালো নয়। তবু তাদের কারোর থেকে একটি পয়সাও নেয়নি নির্মল। প্রথম দিককার চিকিৎসা তো প্রায় ওই করেছে। এসে এসে ইনজেকসন দিয়ে গেছে। ওষুধও জুগিয়েছে অনেক সময় গাঁটের পয়সা খরচ করে। হাসপাতালে ভর্তি করার জন্যেও ছুটোছুটি কম করেনি।

ঘরে রুটি ছিল না। টোস্ট করার জন্যে মনোতোষকে কিছু মাখন আর পাঁউরুটি আনতে পাঠাল জয়া। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বুঝি তোমার রাত তিনটেয় আসা?'

অমিয় বলল, 'পেরে উঠলাম না জয়া। কিন্তু আজকে অফ ডে নিয়েছি। ছুটি নেব ভারত পাবলিশার্স থেকেও। আজ আর ঘর থেকে বেরোব না।'

নির্মল বলল, 'ওহে, আমি কিন্তু বাইরের লোক একজন আছি। দাম্পত্যালাপটা সবখানিই আমার সামনে ক'রে ফেল না যেন।'

জয়া হেসে চা করতে গেল।

খানিকবাদে টোস্টের প্লেট বান্ধবীর হাত থেকে নিতে নিতে নির্মল হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা জয়া, তোমার পায়ে ওটা কি হয়েছে দেখি। আমি আরো ক'বার লক্ষ্য করলুম।'

ডান পায়ের কড়াটার নিচে একটি গোটার মত উঠেছে জয়ার।

নির্মল সে দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওটা কি।'

জয়া বলল, 'কি জানি কি। দেখছি তো কদিন ধ'রে। ফোঁড়া টোড়া হবে বোধ হয়।'

নির্মল আর একটু লক্ষ্য করে বলল, 'তাই হবে। হাসপাতালের কাউকে দেখাওনি আসবার সময়?'

জয়া হেসে বলল, 'না। এসব ফোঁড়া পাঁচড়াও যদি তাদের দেখাব তো তোমরা আছ কি করতে।'

নির্মলও হাসল, 'তা ঠিক।'

কিন্তু বন্ধু যখন পিছনে পিছনে এগিয়ে দিতে এল রাস্তা পর্যন্ত তখন আর হাসল না নির্মল, গম্ভীর মুখে বলল, 'ব্যাপার খুব ভালো মনে হচ্ছে না অমিয়।'

অমিয় বলল, 'কোন্ ব্যাপারটা।'

নির্মল বলল, 'জয়ার পায়ের abcessটার কথা বলছি। একটু কেমন কেমন লাগছে যেন।'

অমিয় অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'খুলেই বল না।'

নির্মল বলল, 'বলছি। তুমি কিন্তু ঘাবড়ে যেয়ো না। ঘাবড়াবার কিছু নেই। ওকে বলে cold abcess. টিবি পেশেন্টদের কারো কারো এরকম abcess হয়। আরও দু'একটা কেস আমি দেখেছি।' নির্মল একটুকাল গম্ভীর হয়ে রইল, তারপর ফের বলল, 'অবশ্য এটা সাধারণ abcessও হতে পারে। যতদূর মনে হচ্ছে তাই। তবু watch ক'রে যেতে হবে। বেশ একটু সাবধানে থাকতে হবে বুঝেছ। আচ্ছা, এক কাজ করো না· ওকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও না কিছুদিনের জন্যে। ওর মার কাছেও তো রাখতে পার।'

অমিয় অবিচল গাম্ভীর্যে বলল, 'না, নিজের কাছে রেখেই ওয়াচ করা ভালো।'

নির্মল বলল, 'বেশ কর। তবে এই নিয়ে মোটেই হৈ চৈ করতে যেয়ো না কিন্তু। ও যেন কিছু মনে না করে, ও যেন টের না পায়। তোমাকে বলে ভালো করলাম না। আমার নিজেরও ভুল হ'তে পারে। আচ্ছা better authority কাউকে দেখাও না।'

অমিয় বলল, 'তাহলে তো সেই হৈ চৈই হবে। দেখা যাক।'

স্বামী ফিরে এলে জয়া বলল, 'তোমার মুখ এত ভার ভার দেখছি যে। তর্কে ঠকে এলে নাকি নির্মলের কাছে।'

অমিয় বলল, 'ঠকব কেন। তোমার কাছে ছাড়া আমি আর কারো কাছে ঠকিনে।'

বিকেলের দিকে জয়া বলল, 'চল, আজ মঞ্জুকে নিয়ে আসি।'

অমিয় বলল, 'থাক না আর কদিন। আনা যাবে।'

জয়া মৃদু হাসল, 'এই বুঝি পিতৃহৃদয়? চল, কতদিন ওকে দেখিনে। আজ গিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসি। মার সঙ্গেও দেখা করে আসা হবে।'

একটু ভেবে অমিয় রাজী হোল। শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক বজায় নেই অমিয়র। ভদ্রতার সম্পর্ক আছে। কিন্তু অন্তরের টান তেমন নেই। বিয়ের বছরখানেক পরেই শ্বশুর মারা গেছেন। শাশুড়ী আছেন, আছে সম্বন্ধী। জয়ার বড় ভাই বীরেন মুখুয্যে। বিয়ে করেছে ছেলেপুলে হয়েছে। চাকরি করে অফিসে। ইনশিওরেন্সের দালালী করে ফাঁকে ফাঁকে। নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। কারো জন্তে কিছু করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু খোঁটা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। জয়ার অসুখের খবর যখন ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল জয়ার মা নিভাননী বললেন, 'হবেই তো। ও মেয়ের ক্ষয়রোগ হবে না কার হবে। দুঃখ দিয়ে দিয়ে অমন মানুষটাকে অকালে মেরে ফেলল সে পাপের শাস্তি হবে না?'

বীরেন বলল, 'মেয়েটাকে খাটিয়ে খাটিয়েই অমিয় মেরে ফেলল মা। চাকরি করবে রাজনীতি করবে, হেঁসেল ঠেলবে। শরীরে এত সয় নাকি?'

এ সব সমালোচনা মনোতোষের সামনেই ওরা করেছিল। সে এসে বলেছিল অমিয়কে। জয়ার অসুখের সময় এইসব দোষারোপ ছাড়া

বলতে গেলে আর প্রায় কিছুই তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। অর্থ সাহায্যের শক্তি বীরেনের ছিল না। অমিয়ও তার কাছে চায়নি কোনদিন। তবু যখনই দেখা হয়েছে বীরেন তাকে বাঁকা কথা শোনাতে ছাড়েনি। শুধু জয়ার মা পাড়ার একটি ছেলেকে সংগে নিয়ে ফলের ঠোঙা হাতে মেয়েকে এসে মাঝে মাঝে দেখে গেছেন। তিনিও অমিয়র সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলেননি। মেয়ের কাছে বসেই নানারকম দুঃখ করেছেন, আক্ষেপ জানিয়েছেন। 'তোর কপালে দুর্ভোগই যদি না থাকবে, এরকম মতিগতি হবে কেন তোর।'

তবু রোগ যখন বেড়েছে নিজের মায়ের কাছেই মেয়েকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে জয়া। অমিয়র ইচ্ছা ছিল নিজের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের কাছে রাখবে কিন্তু জয়া তাতে ভয়ানক আপত্তি করেছে। নিভাননীও মেয়ের মনের কথা বুঝে ছেলে পছন্দ করবে না জেনেও আগ্রহ দেখিয়ে নিয়ে গেছেন নাতনীকে।

জয়াকে দেখে খুশি হলেন মা, বললেন, 'এখন থেকে শরীরের যত্ন নিস। আর হৈ চৈ করিসনে। এ সব রোগ সারলেও সব সময় সাবধান হয়ে থাকতে হয়।'

তারপর জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পারো তো আবার একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ো। আর না হয় পাঠিয়ো ফের সভা-সমিতি করতে।'

অমিয় বলল, 'না, কিছুকাল কোথাও যাতে আর না বেরোয় সেই চেষ্টাই করব।'

বছর তিনেক বয়সে হয়েছে মঞ্জুর। বেশ ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মার মতই অনেকটা নাক চোখের ধরণ। কিন্তু বাবা মাকে দেখে সেই যে দিদিমার পিছনে গিয়ে লুকিয়েছে কিছুতেই আর এলো না।

নিভাননী ঠেলে দিলেন, 'যা, পরের মেয়ে আমি আর কদিন রাখব। লাভ কি রেখে। লাভ কি মায়া বাড়িয়ে। নিজের মেয়েই কত কথা শুনল, কত তাকাল বাপমার মুখের দিকে।'

এসব পুরোন অভিযোগের জবাব না দিয়ে মঞ্জুকে কাছে টেনে আদর করল জয়া। বলল, 'চল যাই আমাদের সঙ্গে।'

কিন্তু অমনিই ঠোঁট ফুলল মঞ্জুর। কাজল পরা দুটি চোখ উঠল সজল হয়ে।

জয়ার ইচ্ছা ছিল, ওকে জোর করেই আনে। কিন্তু অমিয় বাধা দিয়ে বলল, 'থাক না আর কয়েক দিন। পরে এসে একদিন নিয়ে যাব।'

মাঝে মাঝে স্বামীর আচরণের কোন অর্থ খুঁজে পায় না জয়া। আজও তার কাছে অমিয়র ব্যবহারটা একটু হেঁয়ালি হেঁয়ালি মনে হোল।

কিন্তু সে হেঁয়ালি সবচেয়ে বড় আঘাত দিল রাত্রে। অনেক রাত পর্যন্ত কি সব লেখালেখি করল অমিয়, একটা বইয়ের প্রুফ দেখল। জয়ার একটু বুঝি তন্দ্রার মত এসেছিল, জেগে উঠে দেখে মেঝেয় মাদুর পেতে নিজের বালিশ জোড়া নামিয়ে অমিয় কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

আজও যত্ন ক'রে বিছানা পেতেছিল জয়া। দু' জোড়া বালিশ সাজিয়েছিল পাশাপাশি। ফুলদানীতে রেখেছিল রজনীগন্ধার তোড়া। সব ব্যর্থ, সব ব্যর্থ।

স্তব্ধ হয়ে ঘুমন্ত স্বামীর দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল জয়া। বুকের ভিতরে জ্বলে উঠল। কিন্তু চোখ ভরল জলে।

এই লুকোচুরির কি মানে হয়। কি দরকার ছিল এই গোপনতার। বুঝিয়ে বললে কি জয়া বুঝত না? এতদিন পরে একটু আদর করলে, একটু কাছে টানলে কি সঙ্গে সঙ্গে রোগ সংক্রামিত

হত অমিয়র মধ্যে? রোগের এত ভয় অমিয়র, জীবনের এত ভয় যে, ডাক্তারের সার্টিফিকেটও সে বিশ্বাস করছে না? বিশ্বাস করতে পারছে না জয়াকে? আর সেই জন্যে বার বার এমন করে ছলনা করছে, ভাণ করছে কাজের, ভাণ করছে নাইট ডিউটির। সততা বুঝি শুধু দলের কাছেই দেখাতে হয়, স্ত্রীর কাছে সৎ হওয়ার প্রয়োজন হয় না? বুঝিয়ে বললে দোষ কি ছিল, খুলে বললে দোষ কি ছিল এর চেয়ে? জয়া কি নিরক্ষরা নাবালিকা যে বুঝত না? জোর করে আদর সোহাগ আদায় করত অমিয়র কাছ থেকে? জয়ার মনে হ'তে লাগল অমিয় তাকে অপমান করেছে। অত্যন্ত গভীরভাবে, নিষ্ঠুরভাবে অপমান করেছে। আগেকার হাজার সদ্ব্যবহার, হাজার সহৃদয়তা এই অপমানের কাছে তুচ্ছ।

বড় গরম ঘরের মধ্যে। মোটেই হাওয়া নেই। দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। অথচ এত গরমেও কি গভীর তৃপ্তির সঙ্গেই না ঘুমুচ্ছে অমিয়। এত কাল বাদে জয়া ফিরে এসেছে, একতাল বাদে রাত্রে দেখা হয়েছে দুজনের, ভালো-মন্দ কোন কথাই কি অমিয়র বলবার নেই, জয়ার সঙ্গে সব কথাই কি তার শেষ হয়েছে? শুধু নীরস কর্তব্যের সম্পর্ক ছাড়া কি আর কোন সম্পর্কই জয়ার সঙ্গে তার নেই। তার অসুখ হওয়ার পর থেকে অমিয়র চালচলন, আচার-ব্যবহার খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ করে দেখল জয়া। শুধু কর্তব্যের, শুধু নিজের সম্ভ্রম বোধ ছাড়া অমিয়র ব্যবহারের মধ্যে আর কিছুই জয়া খুঁজে পেল না। স্ত্রীর অসুখে চিকিৎসা করিয়েছে অমিয়, না হলে লোকে নিন্দা করে। লোকের কাছে নিজের সম্মান থাকে না, নিজের পৌরুষ নষ্ট হয়। জয়ার মনে পড়ল রোগের শুরু থেকেই অমিয় অত্যন্ত অপ্রসন্ন, মহা-বিরক্ত, যেন জয়া ইচ্ছা করে রোগকে ডেকে এনেছে। একদিন অমিয় বলেছিল, 'এ রোগ আমাদের সর্বস্ব ধরে টান দেবে জয়া আমি বুঝতে পারছি।

টাকাকড়ির কথা ভাবিনে, আছেই-বা কি, আর যাবেই বা কি, কিন্তু আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। তা সবই পণ্ড হবে।'

কাজ কেবল কাজ। কাজের চেয়ে যেন মানুষের জীবন বড় নয়, তার স্বাস্থ্য, তার আনন্দ, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বড় নয়। কাজ তো সেই জন্যেই। কিন্তু জয়ার মনে হোল অমিয়র কাজ সেজন্যে নয়। কাজ শুধু তার আত্মপ্রসাদের জন্যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে। সব কিছু দিয়ে সব কিছুর বিনিময়ে সেই আত্মপ্রতিষ্ঠাই চায় অমিয়। স্বার্থপর, ঘোরতর স্বার্থপর। সে স্বার্থপরতা বাইরের লোকে দেখতে পায় না, ভিতরে থেকে যাকে ঘর-সংসার করতে হয়, সেই শুধু টের পায়।

কিন্তু বড় গরম ঘরের মধ্যে। হবে না গরম, ঘিঞ্জি গলির মধ্যে ঘর, দুটি নামমাত্র জানলা। তা দিয়ে কোনদিন হাওয়া আসে না। আর আছে একটি দরজা সামনের দিকে। সে দরজা তো বন্ধ, কিন্তু কি দরকার ও দরজা বন্ধ রাখাব। দোর এবার জয়া খুলে দিলেই তো পারে। কোন গোপনীয়তা তো নেই দুজনের মধ্যে, আড়াল করে রাখবার মত কোন সম্পর্ক নেই যে, দোর দিয়ে রাখতে হবে।

দোর খুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল জয়া। এসে দাঁড়াল বারান্দায়। আঃ, অনেকক্ষণ পরে একটু হাওয়া পাওয়া যাচ্ছে। এক ফালি চাঁদ আছে আকাশে। এই প্রথম চোখে পড়ল। জীবনে যেন এই প্রথম চোখে পড়ল চাঁদকে। কিন্তু চাঁদ ছাড়াও আরো একজনকে দেখা যাচ্ছে। তারও চাঁদের মতই চেহারা। আকাশে নয়, ছোট্ট উঠানটুকু দিয়ে সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। গরমে সেও ঘরে টিকতে পারছে না। তার ঘর আরো ছোট। তার ঘর আরো নিঃসঙ্গ। না, জয়ার চেয়ে বেশি নিঃসঙ্গ নয়। সে আর জয়া সমদুঃখী।

এদিকে ফিরতেই মনোতোষের চোখে পড়ল জয়াকে। দুজনে তাকাল দুজনের দিকে। একটু কাল তাকিয়ে রইল, দাঁড়িয়ে রইল। তারপর

মনোতোষ আস্তে আস্তে এগিয়ে এল কাছে। আর তাকে আসতে দেখে জয়ার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল, মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। নিজের হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে লাগল জয়া। ও কি আরো এগুবে নাকি? কিন্তু না, আর বেশিদূর এগুলো না মনোতোষ। একটু দূরে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'ঘুম পাচ্ছে না। বড্ড গরম পড়েছে আজ না?'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর আর কেউ কোন কথা বলল না। কথা বলবার কোন প্রয়োজন নেই, সমস্ত সত্তা এক অপূর্ব ভাষায় কথা বলছে। সে ভাষা সভ্য-জগতের ভাষা নয়। তাকে মুখে উচ্চারণ করবার জো নেই। কিন্তু শুধু মুখই তো তার বাহন নয়, শুধু জিভই তো তার মাধ্যম নয়। সমস্ত রক্তের মধ্যে সে ভাষা উচ্চারিত। শিরায় শিরায় তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

আশ্চর্য, বাইরে তো গরম নেই, বাইরে তো হাওয়া আছে। তবু এখানেও দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে কেন জয়ার। এখানেও কেন শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না।

এবারও কথা বলল মনোতোষ। 'বাঃ ভারি সুন্দর ফুলের গন্ধ! কোত্থেকে আসছে—বল তো?'

জয়া বলল, 'কি জানি।'

মনোতোষ বলল, 'মেয়েরা এত ন্যাকামি করতেও জানে।'

জয়া বলল, 'তার মানে?'

মনোতোষ একটু হেসে বলল, 'নিজের খোঁপায় ফুল গুঁজে রেখেছ, আর বলছ জানোনা। ফুলের গন্ধ তো তোমার গা থেকে, তোমার ভিতর থেকে বেরোচ্ছে।'

রাগ করবারই কথা। তবু জয়া রাগ করতে পারল না, পারল না ধমকে উঠতে, মনে হোল বহুদিন এমন ধরণের কথা শোনেনি। ভারি

আশ্চর্য কথা, ভারি অদ্ভুত কথা। জয়ার গায়ে ফুলের গন্ধ, জয়ার ভিতরে ফুলের মাধুর্য। তার দেহ আর রোগের বীজাণুর থলি নয়, ফুলের ডালি।

একটু চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'না, ফুল আমার খোঁপায় নেই। ঘরের ফুলদানিতে আছে। তুমি নেবে? একটু দাঁড়াও।'

রজনীগন্ধার তোড়ায় সাজানো ফুলদানীটা ঘরের ভিতর থেকে নিয়ে এলো জয়া। মনোতোষের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও'।

মনোতোষ বলল, ' না-না।'

জয়া বলল, 'না না কেন, নাও। আমি দিচ্ছি।'

মনোতোষ স্থির দৃষ্টিতে জয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সবই যে দিলে।'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ, সবই দিলুম, তুমি নাও।'

ধীরে ধীরে ফিরে এল জয়া।

রাত ভোর হোল। জেগে উঠে অমিয় বলল, 'এই দেখ, মেঝেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ডেকে তুললে না কেন।'

জয়া বলল, 'আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

মনে মনে ভাবল মিথ্যের জবাব মিথ্যে দিয়েই দিতে হয়।

ঘুম থেকে উঠে ফের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল অমিয়। এক ফাঁকে বলল, 'এতদিন প্রাণপণে দেনা করেছি। এবার তা শোধ দেওয়ার পালা।'

জয়া কোন কথা বলল না। এ যেন জোর গলায় তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে অমিয়, 'তোমার রোগের জন্যেই দেনা করেছি। আর প্রাণপাত করে তা আবার শোধ দিচ্ছি, দেখ কত মহৎ আমি, কত বড়। স্বার্থ ত্যাগ করেছি।'

এ যেন আর কেউ করে না, আর কেউ যেন অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করায় না স্ত্রীর। অমিয় যেন সম্পূর্ণ নতুন কিছু করেছে।

খানিক বাদে দলের আর একটি মেয়ে এল ঘরে। সর্বাণী সেন। বাইশ তেইশ বছর বয়স। বিয়ে থা' এখনো করেনি। তেমন সুযোগ সুবিধে হয়ে ওঠেনি। রঙ কালো। চোখ মুখও যে তেমন সুন্দর তা নয়। কিন্তু এমন একটা দীপ্তি ওর ভিতরে আছে যা লোককে টানে। সবাই বলে সে দীপ্তি বুদ্ধির; তা ওর কর্মনিষ্ঠার! অনেকেই ওর প্রশংসা করে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে অমিয়।

সর্বাণী এসে বলল, 'এই যে বউদি, যাক এবার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরে এসেছ। বাঁচলুম। এবার অমিয়দাকে পুরোপুরি পাওয়া যাবে।'

জয়া বলল, 'এতদিন বুঝি পাওনি।'

সর্বাণী বলল, 'কই আর পেলাম। ওঁর সারা মন তো হাসপাতালে পড়ে থাকত। অন্য কাজকর্মে ভালো করে মন দিতে পারতেন না কি?'

জয়া বলল, 'হুঁ।'

এরপর সর্বাণী গিয়ে অমিয়র টেবিলের ধারে দাঁড়াল, 'কি হোল— আমাদের প্যাম্ফলেটের কতদূর?'

অমিয় মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, 'এই হচ্ছে। অত তাড়া দিচ্ছ কেন।'

সর্বাণী হেসে বলল,' কেবল কি তাড়া দিচ্ছি, না সময়ও দিচ্ছি?'

মেঝেয় বসে চা করতে করতে জয়া সব দেখছে, সব শুনছে। কই, এখন তো অমিয় বেশ হেসে কথা বলতে পারে। এখনকার কর্তব্য তো ওর বেশ রসসিক্ত। আর কি রকম কাছে ঘেষে দাঁড়িয়েছে সর্বাণী। কি রকম হেসে হেসে কথা বলছে। শুধু সময় কেন, আরো দিচ্ছ তুমি আরো দিচ্ছ। তা যে কি জয়ার তা জানতে বাকি নেই, বুঝতে বাকি নেই। কেন বুঝবে না। সেও তো মেয়ে, না হয় ছ' মাসই সে

হাসপাতালে ছিল। না হয় আরো ছ' মাস ধরে সে যক্ষ্মায় ভুগেছে। যক্ষ্মার কীট কেটে কেটে ফেলেছে তার ফুসফুস, তাই বলে তো তার নারীত্বকে নিঙড়ে নিতে পারেনি। যদি পারত, বেশ হোত, বেশ হোত, বাঁচা যেত।

জয়া হাসপাতালে যাওয়ার পর থেকে ইদানীং বড় বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে অমিয় আর সর্বাণীর মধ্যে। তা যে হয়েছে জয়া তা অমিয়র মুখ দেখে, মুখের কথা শুনেই টের পেয়েছে। হাসপাতালে অনেকদিন অমিয় সর্বাণীর সুখ্যাতি করেছে। সবচেয়ে নিষ্ঠা বেশি সর্বাণীর সবচেয়ে যোগ্যতা বেশি। এক একদিন সময় করে সর্বাণী কাঁচড়াপাড়াতেও গেছে অমিয়র সঙ্গে জয়াকে দেখতে। কিন্তু শুধু কি জয়াকেই দেখতে? একসঙ্গে যেতে একসঙ্গে আসতে নয়?

আজও ওরা কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সব কাজের কথা; অকাজও যে মাঝে মাঝে কাজের ছদ্মবেশ ধরে তা কি জয়া নিজেও জানে না? ওরা কথা বলছে, কিন্তু জয়াকে ডাকছে না। মাত্র ছ'মাস বাইরে থেকে জয়া যেন ওদের সব কাজ আর সব কথার বাইরে চলে গেছে। বেশ গিয়ে থাকলে গেছে। জয়া আর ভিতরে থাকতে চায় না।

চা-টা খেয়ে সর্বাণী বিদায় নিল। অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে চলুন।'

অমিয় পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতে দিতে বলল, 'হ্যাঁ চল, কাজটা সেরেই আসা যাক।'

সর্বাণী বলল, 'চললুম বউদি। একদিন যেয়ো কিন্তু।'

জয়া ঘাড় নাড়ল। কোন কথা বলল না।

নির্মলের মুখে cold abcessএর কথা শুনে প্রথমে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল অমিয়। এত খরচপত্র ক'রে জয়াকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু একেবারে রোগমুক্ত ক'রে আনতে পারেনি শুনে

অমিয় হঠাৎ বড় নৈরাশ্য বোধ করেছিল। কিন্তু নির্মলই তাকে বুঝিয়ে বলল যে অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। এ এ্যাবশেষে সমূহ কোন ক্ষতি হবে না জয়ার। চিকিৎসা করাবার সময় পাবে অমিয়। সাবধান মত চলাফেরা, বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা ওর জন্যে করতে হবে। তারপর ধীরে সুস্থে ওকে ঘাবড়ে না দিয়ে সময়মত রোগের কথাটা জয়াকে জানালেই চলবে।

অমিয় বলল, 'কোন অপারেশনের দরকার হবে নাকি এখন ?

নির্মল বলল, 'না না না, ওতে এখন হাতই দেব না আমরা। যেমন আছে তেমনই থাকবে, শুধু ওয়াচ ক'রে যেতে হবে।'

এরপর অমিয় খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছিল।

কাজের চাপ কিছু বেশিই পড়ল অমিয়র ওপর। বলা যায় ইচ্ছা করেই বেশি কাজ সে নিল। জয়ার অসুখের জন্য বন্ধুদের কাছে অনেক ধার হয়েছে। সে টাকা শোধ না করা পর্যন্ত অমিয়র স্বস্তি নেই। তাছাড়া ইতিমধ্যে উত্তমর্ণদের কেউ কেউ তাগিদ দিতেও শুরু করেছে। নিজের প্রয়োজনের সময় তাদের কাছ থেকে নিয়েছে এখন তাদের প্রয়োজন না দেখলে চলবে কেন ?

অফিস থেকে যে সামান্য এলাউন্‌স্‌ পায় তাতে বাসা খরচই চলে না, তাই শুধু মাইনের টাকায় এ দেনা শোধ করার চেষ্টা মূঢ়তা। দুহাতে অতিরিক্ত কাজ নিতে লাগল অমিয়। ইয়ারবুক, নোট বই, স্কুলের র‍্যাপিডরিডার পাবলিশার মহলে ঘুরে ঘুরে যা পেল তাই নিল। খাটুনির তুলনায় টাকা বেশি নয়। কিন্তু এ টাকাই বা তাকে কে দেবে।

এই সঙ্গে আর একটি কাজ হাতে এল অমিয়র। দলের পক্ষ থেকে বাংলা দেশের গত পঞ্চাশ বছরের বিংশ শতাব্দীর এই প্রথমার্ধের সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাস লিখতে হবে। প্রথমে টাকা মিলবে না, পরে বই বেরোলে কিছু পারিশ্রমিক পাওয়া যাবে। অমিয় ছিল

ইতিহাসের ছাত্র। সেইজন্যেই বেছে বেছে তার ওপরই ভার দেওয়া হোলো কাজের।

এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পেয়ে অমিয় খুব সম্মানিত বোধ করল। স্ত্রীকে ডেকে শোনাল সুখবরটা। বলল, 'কি বল নেব ?'

জয়া একটু হাসল, 'নিয়ে বসে আছ, এখন বলছ নেব ?'

অমিয় একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'ওঁরা এমন করে ধরে বসলেন যে না নিয়ে পারলাম না। অবশ্য যোগ্যলোকের তো অভাব ছিল না, তবু কেন যে আমার ওপর—'

জয়া বলল 'তুমিই বা অযোগ্য কিসে।'

অমিয় বলল, 'তোমার খানিকটা সাহায্যও পাব। সেই ভরসাতেই নিলাম।'

জয়া একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'বাজে কথা বলো না। আর যার ভরসাতেই হোক তুমি আমার ভরসাতে নামনি। আমি ইতিহাসের কিই বা জানি। সর্বাণীর দাদা সুরেশ্বর যেন হিস্ট্রির প্রফেসর্। তুমি ওঁদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই খুব সাহায্য পাবে।'

জয়া অদ্ভুত একটু হাসল।

অমিয় সে হাসি লক্ষ্য না ক'রে বলল, 'তা ঠিক। অবশ্য সুরেশ্বরের ওপরই প্রথমে ভার দেওয়ার কথা হয়েছিল। কিন্তু তার মুখ যেমন চলে কলম তেমন চলে না। বাংলা লেখার অভ্যাস বলতে গেলে তার নেই-ই। অবশ্য বইপত্র দিয়ে সে সাহায্য করতে পারবে।

জয়া বলল, 'কেবল বইপত্র কেন আরো অনেক রকম সাহায্যই তাঁর কাছে পাবে।'

অমিয় স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'তার মানে ?'

জয়া বলল, 'মানে আবার কি ? যাই রান্না দেখে আসি।'

উঠে সংসারের কাজে চলে গেল জয়া।

মুহূর্তের জন্যে একটু চিন্তিত হোলো অমিয়। কিন্তু চিন্তাটাকে বেশি আমল দিল না। সর্বাণীকে নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাসা করতে জয়া ভালোবাসে। অমিয়কে একটু রাগাতে পারলে কৌতুক বোধ করে। সবাই জানে অমিয়র সঙ্গে সর্বাণীর যে ঘনিষ্টতা সে শুধু সহযোগীর সহকর্মীর। তার মধ্যে আর কিছু নেই। তাছাড়া সর্বাণী দলের আর একটি ছেলেকে ভালোবাসে। শুভেন্দু সমাদ্দার। পূর্ব-পাকিস্তানে বিনাবিচারে আটক বন্দী রয়েছে তিন বছর ধরে। কবে যে ছাড়া পাবে কিছু ঠিক নেই। শুভেন্দুর মত অমন নিষ্ঠাবান পরিশ্রমী কর্মী বিরল। তার জন্যে ভারি মায়া হয় অমিয়র, মায়া হয় সর্বাণীর জন্যে। সেদিন বিকেল বেলায় কাগজপত্র নিয়ে বেরোতে যাচ্ছে অমিয় জয়া বলল, 'কোথায় চললে ?'

অমিয় বলল, 'প্রথমে যাব একটু সুরেশ্বরদের ওখানে। তারপর অফিসে।'

জয়া বলল, 'আজ থেকে তোমার বুঝি ফের নাইট ডিউটি শুরু হোলো।'

অমিয় বলল, 'হ্যাঁ। এবার একটানা মাস তিনেক নাইট ডিউটিই করব ভেবেছি। দিনের অন্য কাজ—বিশেষ করে বইটইয়ের কাজের পক্ষে তাতে সুবিধে !'

জয়া বলল, 'শুধু নিজের সুবিধের কথাই ভাবছো।'

অমিয় একটু ভ্রূকুঁচকে বলল, 'তার মানে ?'

জয়া বলল, 'মানে আবার কি, মানে তুমি আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চাও। তুমি চাওনা দিনে কি রাত্রে আমি তোমার কাছে একটু আসি কি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি। আমাকে তোমার আর প্রয়োজন নেই। জীবনে আর তোমার কোন প্রয়োজনে আসব না এটা তুমি বুঝে নিয়েছো।'

ভারি বিরক্ত হোল অমিয়। একটু রুক্ষস্বরেই বলল, 'কি যা তা বলছো! দিনরাত এত খাটছি কিসের জন্যে, কার জন্যে? অকৃতজ্ঞতারও একটা সীমা আছে জয়া।'

আক্ষেপ আর অভিযোগ ভরা কথাটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল অমিয়র।

জয়া একটুকাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আছেই তো। ভয় নেই সে সীমা আমি লঙ্ঘন করবনা। তুমি আমার অসুখে চিকিৎসা করিয়েছ ধার দেনা ক'রে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছ সে আমি জানি, তার জন্যে সারাজীবন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। তুমি তো কৃতজ্ঞতা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু চাও না।'

অমিয় আগের মতই অসহিষ্ণুভঙ্গিতে বলল, 'চাই জয়া, সব চাই। কিন্তু আমাকে একটু অবসর দাও, একটু ফুরসুৎ পাওয়ার সময় দাও আমাকে। দেখ, দুনিয়াটা বড় শক্ত বস্তু। ভৌগোলিক পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। কিন্তু মানুষের কাজের পৃথিবীটা অন্য রকম। রেশিওটা একেবারে উল্টো। সেখানে রসের চেয়ে রসদের দাম বেশি।'

জয়া বলল, 'থাক থাক, থামো। কিসের দাম যে কি তা আর তোমাকে বোঝাতে হবে না। তা আমার জানা আছে? আমিও চুপ ক'রে বসে নেই। চাকরির চেষ্টায় আছি। যেমন ক'রে পারি আমার অসুখের জন্য যে দেনা তোমার হয়েছে তা আমি শোধ করব। দাসীগিরি করে হোক ঝিগিরি করে হোক দু'বছরে হোক, পাঁচ বছরে হোক সব আমি শোধ ক'রে দেব। কত দেনা হয়েছে তোমার? দেড় হাজার দু'হাজার না পাঁচ দশ হাজার কত হয়েছে বলো আমাকে।'

অমিয় বলল, 'না অত হয়নি, অনেক কম। কিন্তু আমার পক্ষে নেহাৎ কম নয়। সে যাক, দেনার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি বিশ্রাম করো।' তারপর একটু থেমে কোমল সহানুভূতির স্বরে বলল, 'জানি তোমার একা একা লাগে, কিন্তু কি করব বলো। যে কাজ ঘাড়ে চেপেছে তা তো ফেলে রাখলেও চলবে না।'

জয়া প্রতিবাদ করে বলল, 'দেখ কাজের দোহাই দিও না। কাজ সবাই করে। কিন্তু তুমি শুধু কাজ নয় কাজের বড়াই করতেও ভালোবাসো।'

অমিয়র মুখ কঠিন হয়ে উঠল, 'হবে! আমার স্বভাবই বোধ হয় তাই।'

আর কোন কথা না বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল অমিয়। জয়া খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইল চুপ করে। সব যেন শুকনো মরুভূমি হয়ে গেছে। কোথাও এক ফোঁটা রস নেই, এক ফোঁটা মায়া মমতা নেই কারো মনে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে এই শুকনো মরুভূমির জন্যেই কি আরোগ্য কামনা করেছিল জয়া। এর চেয়ে সেই ওষুধের বিচিত্র গন্ধে ভরা রোগী জমাদার নার্সের জগৎ যে অনেক ভালো ছিল। যেখানে তারা সবাই একেবারে আপন করে নিয়েছিল জয়াকে।

কিন্তু এই সুস্থ স্বাভাবিক দুনিয়া এখনো যেন তা নিতে পারছেনা। এখনো তারা জয়াকে সন্দেহ করছে, দূরে দূরে রেখে যাচাই ক'রে নিতে চাইছে রোগটা তার সম্পূর্ণ সেরেছে কিনা।

মা আর দাদা ছাড়া জয়াদের আত্মীয়স্বজন তেমন কেউ নেই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে শুধু রক্তের সম্বন্ধই আছে মনের সম্বন্ধ ভাবের সম্বন্ধ প্রায় নেই বললেই চলে। জয়ার ইচ্ছা নয় মেয়েটাকে সেখানে

আর বেশি দিন রাখে। কিন্তু অমিয়র গাফিলতিতেই তাকে নিয়ে আসা হচ্ছেনা। আজ নয় কাল বলে সে কেবলই কাল হরণ করছে।

আত্মীয় স্বজন নয়, দু' একজন বন্ধু বান্ধবের বাড়িতেই দেখাসাক্ষাৎ ক'রে এসেছে জয়া। গিয়েছে নির্মলদের বাসায়। তাকে পায়নি। তার স্ত্রী নীলিমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পসল্প ক'রে উঠে এসেছে। গল্প বেশিক্ষণ জমেনি। দুই সন্তানের মা নীলিমা পুরোদস্তুর গৃহিনী; ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। জয়া খোঁচা দিয়ে বলেছে, 'কই তুমি তো একবার গেলেও না নালি।'

নীলিমার কৈফিয়তের অভাব হয়নি. সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে, 'সময় পেয়ে উঠিনি ভাই। একা মানুষ, সবদিক সামলে উঠতে পারিনে। কদিন ধরে মেয়েটা আবার সর্দি কাসিতে ভুগছে। পেটটাও ভালো যাচ্ছেনা। একটু সারুক তারপর যাব।'

জয়া মনে মনে হেসেছে। নীলিমার হয়ে গেছে। ঘর সংসার ছাড়া ওকে দিয়ে আর কিছু হবেনা। ওর কাছ থেকে পার্টির আশা করবার আর বিশেষ কিছু নেই।

ঘুরতে ঘুরতে একদিন সর্বাণীদের বাড়িতেও গিয়েছিল জয়া। দাঙ্গার পর পার্ক সার্কাস নাসিরুদ্দিন রোডে সম্প্রতি বাসা নিয়েছে ওরা। সস্তায় ভাড়া পেয়েছে দোতলায় তিনখানি বেশ বড় বড় ঘর। মাত্র পঞ্চাশ টাকা ভাড়া। সর্বাণী কি তার দাদা সুরেশ্বর কেউ বাসায় ছিল না। তার মা সুধারাণীই এসে জয়াকে ভিতরে নিয়ে গেলেন, 'এসো মা এসো। খুব খুশি হলাম। সুস্থ হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছ এই আমাদের ভাগ্য।'

বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স হবে সুধারাণীর। রোগা ছিপছিপে চেহারা। পরণে সাদা থান। সাদা ব্লাউস। জয়া লক্ষ্য করল তার

মার মত মাথার চুল সুধারাণী ছোট করে ছেঁটে ফেলেননি, পিঠভরে ছড়িয়ে রেখেছেন। সে চুল এখনো ঘন কালো আর মসৃণ।

জয়া বলল, 'আমি তো সুস্থ হয়েছি। কিন্তু আপনার শরীর তো ভালো দেখছিনা মাসীমা।'

সুধারাণী মৃদু হেসে বললেন, 'এই বয়সে আবার শরীর।' ঘরে নিয়ে গিয়ে মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে বসতে দিলেন জয়াকে। এখানা গৃহস্থালীর বড ঘর। উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা বড় ট্রাঙ্ক গোটা দু'তিন সুটকেস। পাশাপাশি দু'খানা ছোট ছোট তক্তপোষ পাতা। বিছানা সযত্নে গুটানো।

জয়া ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'বাঃ ঘরখানা তো চমৎকার গুছিয়ে রেখেছেন মাসীমা। আপনাদের মত সাজাতে গুছাতে আমরা পারিনা।'

সুধারাণী স্মিতমুখে বললেন, 'ক্রমেই পারবে। ঘর গুছাবার কথা বলছ। কিন্তু গুছিয়ে লাভ কি বল। ছেলে মেয়ে কি আমার কথা শোনে। নাকি ঘরের দিকে ওদের কারো মন আছে! সারা দিন তো ওদের বাইরে বাইরেই কাটে। এত করে বলি তোরা বিয়ে কর। আমার পছন্দমত নয় নিজেদের পছন্দমত নিজেরা যাদের ভালোবাসিস তাদের নিয়েই ঘর সংসার কর তোরা। তবু সংসারী হ। কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দেয়না। দুই ভাই বোনে এক জোট হয়েছে।'

জয়ার মনে পড়ল, বাল্যে কৈশোরে নিজের দাদার সঙ্গেও এমনি গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল জয়ার। কিন্তু অমিয়কে বিয়ে করার পর সেই দাদাই সব চেয়ে বেশি পর হয়ে গেছে।

জয়া বলল, 'সর্বাণী কখন ফেরে?'

সুধারাণী বললেন, 'তার কি কিছু ঠিক আছে মা, তার সভাসমিতি,

কাগজের অফিস, নাইট স্কুল রোজ একটা না একটা লেগেই আছে। ওদের চেয়ে অমিয়র সঙ্গেই বরং আমার দেখা সাক্ষাৎ বেশি হয়।'

জয়া বলল, 'তিনি বোধ হয় রোজই আসেন এখানে।'

সুধারাণী বললেন, 'ঠিক রোজ নয়, তবে প্রায়ই আসে। সুরেশের ঘরে বসে লেখে, পড়াশুনো করে, কি সব নোট ফোট নেয়। অমিয় যতক্ষণ এখানে থাকে আমি টেরও পাই না সে আছে কি না আছে। কিন্তু আমার মেয়ে এলে আর রক্ষা নেই, তর্কে-বিতর্কে ছেলেটাকে একেবারে অস্থির ক'রে তোলে। আমি যত ডাকি ওরে বক্তৃতাওয়ালী ঢের হয়েছে, এখন এদিকে আয় এবার ঘরসংসাব দেখ এসে, ওকে ওর কাজ করতে দে। কিন্তু কে শোনে কার কথা, ওরা তর্ক পেলে, বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেলে কি আর কিছু চায় ?'

জয়া সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে বলল, 'তা ঠিক, ওরা আর কিছু চায় না।' মনে মনে ভাবল ওরা আর কাউকে চায় না। এখন বুঝতে পারছে জয়া বাড়ি ফিরতে অমিয়র এত রাত হয় কেন। এত জায়গা থাকতে কেন বেছে বেছে এই বাড়িতেই অমিয় তার গবেষণা-মন্দির গড়ে তুলেছে। স্বামীর ঔদাসীন্য অবজ্ঞা আর অবহেলার কারণ এবার বুঝতে পারছে জয়া। হঠাৎ বুকের ভিতরটা জয়ার জ্বালা ক'রে ওঠে। এ জিনিস সে সহ্য করবে না, কিছুতেই সহ্য করবে না।

একটু বাদে জয়া উঠে দাঁড়াল, বলল, 'চলি মাসীমা। সন্ধ্যাকে বলবেন, আমি এসেছিলাম।'

সুধারাণী বললেন, 'তাতো বলবই। কিন্তু তুমি এক্ষুণি উঠতে চাইছ সে কি কথা। এতদিন বাদে এলে একটু চা-টা—

জয়া অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'না মাসীমা। চা আমি খেয়েই বেরিয়েছি। এখন আর খাব না। বেশি চা সহ্য হয় না। খেতে বারণও আছে। আর একদিন এসে না হয়—'

যেতে যেতে হঠাৎ সর্বাণীর তক্তপোষখানার ধারে জয়া একটু থেমে দাঁড়াল। শিয়রের কাছে ছোট একটা কুলুঙ্গি। তাতে এক গাদা বই, বেশির ভাগ ইতিহাস, দর্শন, আর অর্থনীতি। লেনিন স্ট্যালিনের রচনাবলী। হঠাৎ এদের ভিতর থেকে আর একখানা বই উঁকি দিল। জয়াদের 'সঞ্চয়িতা'খানা। চেহারা থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, ভিতরের একটা পাতা উল্টাতেই অমিয়র নামটা বেরিয়ে পড়ল।

জয়া একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। এ বই এখানে! হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে অনেক বইয়েরই অবশ্য খোঁজ পায়নি জয়া।

স্বামীকে অভিযোগ ক'রে বলেছিল, 'বইগুলি সব খুইয়ে বসে আছ। সেলফ একেবারে যে খালি হয়ে গেছে।'

অমিয় বলেছিল, 'তুমি তো ছিলে না। যে যা পেরেছে দু'হাতে লুটে নিয়েছে।'

জয়া হেসে বলেছিল, 'দয়া করে তোমাকে যে রেখে গেছে তাই যথেষ্ট।'

আজ বুঝতে পারছে জয়া লুঠপাট শুধু তার সেলফের ওপর দিয়েই হয়নি।

নিজেদের বইখানাকে হঠাৎ যেন ছোঁ মেরে তুলে নিল জয়া, বলল, 'বইখানা নিয়ে যাই মাসীমা। আমার বই। অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও পাইনি। ভেবেছিলাম হারিয়েই বুঝি গেল। সর্বাণী যে এনে রেখে দিয়েছে তাতো জানিনে।'

সুধারাণী একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'ওর কথা আর বলো না। ওর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে, দায়িত্বজ্ঞান আছে। তোমার বই তুমি নিয়ে যাও জয়া।'

উত্তর দিকে পাশাপাশি আরো দু'খানা ঘর। একখানা সুরেশ্বরের থাকবার। বাইরে থেকে শিকল টেনে দেওয়া। আর একখানা ঘরের

দরজা খোলাই আছে। কিন্তু সামনে ঘন নীল রঙের পর্দা টাঙানো। এই নিরালা ঘরখানিতে বসেই বোধ হয় অমিয় তার ইতিহাস লেখে। লেখার নামে সর্বাণীর সঙ্গে সারা সন্ধ্যা তর্ক করে, গল্প করে, আরো কি করে কে জানে। পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকলে হয়তো দু'জনের গোপন অনুরাগের আরো কত নিদর্শন জয়ার চোখে পড়বে। ঢুকে দেখবে নাকি একবার? না না, দরকার নেই, দরকার নেই।

দ্রুতপায়ে পথটুকু পার হয়ে আমীর আলী এভেনিয়ুর ট্রামলাইনের কাছে এসে দাঁড়াল জয়া। রাস্তা পার হয়ে ডিপোর কাছে গিয়ে একটা ট্রামে উঠে পড়ল। বেশি ভিড় নেই ট্রামে। এতক্ষণ পরে এই সন্ধ্যার সময় একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। শরীরটা একটু ভালো বোধ করল জয়া। মনে মনে ভাবল এ সব কি পাগলামি করছে, এ সব কি আজে-বাজে কথা ভাবছে সে অমিয়র সম্বন্ধে। তার কি মাথা খারাপ হোলো? এসব ভেবে লাভ কি। এতে তো নিজেরই যন্ত্রণা, এ কল্পনায় তো নিজেরই কষ্ট। কিন্তু আশ্চর্য, মাঝে মাঝে কষ্ট পেতেও যেন ভালো লাগে! ভাবতে বেশ মজা লাগে অমিয়র সঙ্গে সর্বাণী খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আর তাই নিয়ে ওদের বদনাম রটছে দলের মধ্যে।

নিজেদের সংস্কৃতিকেন্দ্রেও একদিন গিয়ে ঘুরেফিরে এল জয়া। আগেকার মত জমাট ভাব আর নেই। কেমন যেন ভাঙা হাটের মেলা। সদস্যদের উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। ঘরের এ-কোণে ও-কোণে ছোট এক একটি বন্ধুচক্রের জটলা। দু'একটি পরিচিত ছেলেমেয়ে জয়াকে দেখে মাথা নাড়ল, অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করল। কেবল অসুখ আর অসুখ। জয়া যে অসুস্থ হয়েছিল এই কথাই সকলে মনে রেখেছে। সে যে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছে একথা যেন কেউ মেনে নিতে পারছে না, নিজেদের মধ্যে তাকে টেনে নিতে পারছে না আগের মত। জয়া বেশিক্ষণ আর বসল না সেখানে। ফিরে এল নিজের

ঘরে। কিন্তু ঘরও তো শূন্য, ঘরও তো শুকনো। সেখানে প্রাণ নেই, আনন্দ নেই; আছে শুধু কাজ আর কাজ। অমিয় কৈফিয়ৎ দেবে এতকাজ জয়ার জন্মেই। জয়ার চিকিৎসার দেনা শোধ করবার জন্মেই তার এই কঠিন কর্মযজ্ঞ। কিন্তু সে যজ্ঞে জয়াই যে প্রথম আহুতি—হয়ত বা একমাত্র আহুতি। জয়াকে ভুলে তার চিকিৎসার দেনা নিয়ে মেতে উঠেছে অমিয়। কিন্তু দেনা কি অত সহজে শোধ হয়? আর দেনা কি কেবল বন্ধুদের কাছে?

সন্ধ্যার পর মনোতোষ বাসায় ফিরল। সাইকেলটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে গলা ছেড়ে ডাকল, 'বউদি, ও বউদি।'

তারপর সন্ধানী চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবিষ্কার করল সম্মুখে দরজার দিকে পিছন ফিরে জয়া দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিমের জানলায়, পরণে আটপৌরে শাড়ি, আধময়লা। আঁচল মাটিতে লোটানো।

গায়ের হাফ সার্ট আর গেঞ্জি খুলে ফেলল মনোতোষ। তারপর বলল, 'ঈস' এত গরমে, এই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ। কি দেখছ জানলা দিয়ে? সরকারদের পাঁচিল দেখবার পথ একেবারে বন্ধ করে রেখেছে! ওখানে কোন প্রকৃতির শোভা দেখছ বউদি?' বলতে বলতে পাশে এসে দাঁড়াল মনোতোষ। গায়ের ছোঁয়া লাগল গায়ে। একটু সরে দাঁড়াল জয়া। লুটিয়ে পড়া আঁচলটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়াল। তারপর তাকাল মনোতোষের দিকে। খোলা গা। সবল দীর্ঘ দেহ। রোমশ বিস্তৃত বুক। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে সেখানে। মনোতোষ পূর্ণদৃষ্টিতে জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি দেখছিলে বলো?'

জয়া একটু যেন চমকে উঠল, চোখ নামিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'কি আবার দেখব। যাও, তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস, আমি ততক্ষণে চা করি।'

মনোতোষ বলল, 'দাঁড়াও, অত তাড়া দিওনা। চায়ের জন্মে আমার তত গরজ নেই। আমি চা চাইনে।'

জয়া বলল, 'তবে কি চাও!'

জিজ্ঞেস ক'রেই জয়ার আশঙ্কা হোলো। পাছে কোন বেফাঁস কথ বলে বসে মনোতোষ। সেদিনের সেই ঘুম না হওয়া গভীর রাত্রে ফুলের তোড়া পাওয়ার পর থেকে মনোতোষের সাহস বেড়ে গেছে। সুযোগ পেলেই ও আজকাল কাছে এসে দাঁড়ায়, চড়ামাত্রায় হাসি-ঠাট্টা করে। আর অদ্ভুতভাবে তাকায়। সে দৃষ্টির একইমাত্র অর্থ। জয়ার কেমন ভয় ভয় করে, শির শির করে গা। ভাবে প্রতিবাদ করে, ধমক দেয় মনোতোষকে। কিন্তু পারে না, কোথায় যেন আটকে যায়, কিসে যেন আটকে যায়। জয়া ভাবে সে বাধা রুচির। জয়া ভাবে ওকে তেমন ক'রে বাধা দিলে কাজটা বড় অশোভন হবে। তাতে মনোতোষকে হয়ত আরো সচেতন ক'রে দেওয়া হবে। তার চেয়ে ঢের ভালো ওকে অবজ্ঞা করা, ওকে আমল না দেওয়া, আরো ভালো যদি হেসে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে জয়া। কিন্তু তা পারে কই; হাসবার আগে দম যে বন্ধ হয়ে আসে, বুকের ভিতরটা যে কাঁপতে থাকে।

মনোতোষকে ধমকাতে পারে না জয়া, ওকে দুঃখ দিতে অপমান করতে জয়ার মনে কষ্ট হয়। পৃথিবীর সকলে যখন জয়ার ওপর অমনোযোগী হয়েছে তাকে অবহেলা সুরু করেছে তখন মনোতোষের সমস্ত মন পড়েছে জয়ার ওপর। একজনের পূর্ণ মনোযোগের পাত্র হ'তে ভারি আনন্দ লাগে। অবশ্য মনোতোষের রুচি স্থূল, ওর ভাষা আর ভঙ্গি অমার্জিত। কিন্তু তাতে কি এসে যায়। জয়ার ওপর মনোতোষের যেমন দরদ আছে তেমন আর কারো নেই। সেই দরদই আসল। ওর রুচির স্থূলতা ভাষার রূঢ়তা সেই দরদে ঢাকা পড়ে। তাছাড়া জয়ার মাঝে মাঝে মনে হয় এই অমার্জিত ভাষা-ভঙ্গিই মনোতোষকে সবচেয়ে মানায়।

যেমন মানিয়েছে ওকে ওর বলিষ্ঠ দেহ। ওই ওর স্বকীয়তা। আকারে প্রকারে আচারে আচরণে মনোতোষ যে একটুও অমিয়র মত নয়, তার মত উদাসীন অমনোযোগী নয়, সেই তো যথেষ্ট ভাগ্য। মানোতোষ যদি অমিয়র ছাঁচে ঢালা হোত তাহলে কি একমুহূর্তও জয়া ওকে সহ্য করতে পারত? তাহলে কি ওর মধ্যে এমন বৈচিত্র্য এমন অভিনবত্ব, এমন আনন্দঘনতা থাকত?

'একটা কথা বলব বউদি, সত্যি জবাব দেবে?'

মনোতোষের গলার স্বরে হঠাৎ চমক ভাঙল জয়ার, তারপর সেই চমকাবার জন্যে নিজেই একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'কি কথা বল।'

মনোতোষ বলল, 'অমিয়দার সঙ্গে আজও বুঝি তোমার ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে?'

জয়া একটু রূঢ়স্বরে বলল 'হয়ে থাকলে হয়েছে। তাতে তোমার কি।'

কিন্তু পরমুহূর্তেই মৃদু সুন্দর হাসিতে কোমল হয়ে উঠল জয়ার মুখ, কোমল হোল মুখের ভাষা। জয়া মনোতোষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে। সত্যি জবাব দিলাম, স্বীকার করলাম তোমার কাছে। এবার আমার একটা কথার সত্যি জবাব দাও তো। বুঝব সাহস।'

'বলো।'

জয়ার শুধু মুখেই হাসি নেই, দুষ্টু চপল হাসিতে ওর দুটি চোখও ভরে উঠেছে। সেই হাসিভরা মুখ, সেই হাসিভরা চোখে জয়া গলা নামিয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'আমাদের ঝগড়ার কথা শুনলে তুমি খুব খুশি হও, তাই না?'

জয়ার সেই হাসিতে সেই ফিস ফিস ক'রে কথা বলবার ভঙ্গিতে মনোতোষের বুকের রক্ত তোলপাড় হ'তে লাগল। রক্তবর্ণ হয়ে উঠল সমস্ত মুখ। তীব্র প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'মোটেই না, মোটেই না।'

কিন্তু জয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে তেমনি তাকিয়ে রইল।

মনোতোষ হঠাৎ, অস্থির উত্তেজিত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, তাই। খুসি হই, খুব খুসিই হই। কি করবে তুমি? তাড়িয়ে দেবে? নালিশ করবে? করো। আমি কারো পরোয়া করিনে।'

বলে মনোতোষ হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর জয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে ওরও যেন লজ্জা হচ্ছে। ওর এই লজ্জাকে প্রশ্রয় না দিয়ে, হেসে উড়িয়ে দেওয়াই উচিত ছিল জয়ার। কিন্তু জয়া হাসতে পারল না, স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ভালো লাগা উচিত নয়, তবু ভিতরে ভিতরে ভালো লাগছে। তাদের ঝগড়া শুনে আর একজন আনন্দ পায় এই অত্যন্ত অসঙ্গত অশোভন স্বীকৃতিতে জয়ার মন পুলকে ভরে উঠেছে, লজ্জা পাওয়ার কথা মনেও হচ্ছে না।

কাপড় ছেড়ে রঙীন লুঙ্গি পরল মনোতোষ, তারপর হাত মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ফের এসে জয়ার সামনে দাঁড়াল। যেন কিছুই হয়নি তেমনি শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'লাগবে না ঝগড়া? ঝগড়ার দোষ কি? অত খাটলে, অত কাজ করলে মানুষের মন-মেজাজের ঠিক থাকে? তার দোষ কি।'

মনোতোষের এই ভদ্রতায়, এই কৃত্রিম সহানুভূতিতে জয়ার মনে মনে হাসি পেল। কিন্তু সেও ছদ্ম অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'তার কোন দোষ নেই, সব দোষ আমারই? এই বুঝি তোমার বিচার হোলো মনোতোষ?'

বিচক্ষণ বিবেচকের ভঙ্গিতে মনোতোষ বলল, 'না, তোমারও পুরোপুরি দোষ নয়। তুমিও তো সারাদিন খালি বাড়িতে একা একা থাক। এতদিন হাসপাতালে পড়েছিলে কেউ কাছে ছিল না। এখন তোমারও তো আপনজনের কাছে একটু আদর-যত্ন পেতে ইচ্ছে করে, আদর-যত্ন করতে ইচ্ছে করে—'

হঠাৎ যেন একটু লজ্জা পেল মনোতোষ। তাড়াতাড়ি কথাটা পালটে

নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, মেয়েটাকেই বা তোমরা সেখানে ফেলে রেখেছ কেন? তাকে যদি কাছে এনে রাখ, তাহলে তো তোমাকে এমন একা একা পড়ে থাকতে হয় না। চল বউদি, আজই মঞ্জুকে নিয়ে আসি গিয়ে চল।'

এগিয়ে এসে হাত ধরে জয়াকে টেনে তুলল মনোতোষ। এখন যেন ওর কোন সংকোচ নেই, কোন জড়তা নেই।

এর আগে জয়াকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চেয়েছে মনোতোষ, সিনেমায় নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেছে। কিন্তু জয়া রাজী হয়নি। হেসে বলেছে, 'আর একদিন যাওয়া যাবে এখন থাক।' মনে মনে ভেবেছে তবুতো মনোতোষ বলে, কিন্তু যার বলবার সে একবারও এসব কথা মুখে আনেনা। তার অন্যদিকে তাকাবার ফুরসুৎ নেই। না, শুধু জয়ার বেলায় নেই; অন্য কারো বেলায় আছে। আছে যে তাতো জয়া দেখেই এসেছে, টের পেয়েই এসেছে। বুকের মধ্যে কিসের যেন একটা কাঁটা বিঁধল জয়ার।

মনোতোষ আবার বলল, 'চল বউদি।'

জয়া বলল, 'কি যে বল এই রাত্রে—'

মনোতোষ বলল, 'রাত কোথায়, সবেতো সন্ধ্যে। চল বাসে করে যাব আর আসব। কতক্ষণ বা লাগবে। ছেলেপুলে বাড়িতে না থাকলে বাড়ি কি ভালো লাগে? আর দেরি নয়, কাপড় বদলে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, কি একটা ময়লা শাড়ি পরে রয়েছ, তোমাকে মোটেই মানায় না।'

জয়া মুখ টিপে হাসল, 'তাই নাকি?'

তারপর সত্যিই এবার গা ধুয়ে চুল বেঁধে শাড়ি বদলে বেরোবার জন্যে তৈরী হয়ে নিল জয়া। ঠিকই বলেছে মনোতোষ। মঞ্জুকে আজ নিজেই গিয়ে নিয়ে আসবে। মঞ্জু কাছে থাকলে সারা বাড়ি আর এমন খাঁ খাঁ করবে না।

মনোতোষও স্নান ক'রে চুল আঁচড়ে ফর্সা জামা-কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিল। ব্যাক ব্রাস করা চুল, গায়ে শাদা পাঞ্জাবী, পরণে কোঁচানো ধুতি। ইদানীং পোষাকে পরিচ্ছদে সৌখীনতা আরো বেড়েছে মনোতোষের। জয়া তা লক্ষ্য করেছে, ঠাট্টা তামাসাও করেছে একটু আধটু। আজও বলল, 'ঈস, একেবারে ফুলবাবু সেজে চললে যে। বিয়ের বরযাত্রী যাচ্ছ নাকি?'

মনোতোষ জবাব দিল, 'আমাকে কি বরযাত্রীর মত দেখায় না বরের মত দেখায়, সত্যি বলো। কিন্তু আমি যদি ফুলবাবু হয়ে থাকি তুমিও ফুলবিবি হয়েছো। চাঁপা রঙের শাড়িতে তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে।'

জয়া লজ্জিত হোল খুশিও হোল। মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'হয়েছে হয়েছে। তোমাকে আর তোষামোদি করতে হবেনা। চল এবার বেরোই।'

খানিকটা হেঁটে দুজনে কলেজস্ট্রীটে পড়ল। পথে যানবাহন আর জনস্রোত, ঘরে ঘরে আলো। গোলদীঘির জলে সেই রঙীন আলোর ঝিকিমিকি। রেলিং এর কাছে একটু কাল দাঁড়িয়ে রইল জয়া। পৃথিবীতে এত রঙ, এত আলো। শুধু চোখ মেলে ভালো করে তাকাতে জানলেই হয়। মিথ্যাই সে অখিল মিস্ত্রী লেনের সেই অন্ধকার একতলা ঘরখানির মধ্যে নিজের জগৎকে বন্দী ক'রে রেখেছে, নিজেকে বন্দী করে রেখেছে। আর নয়, এবার থেকে সে রোজ বেরোবে, সকাল সন্ধ্যায় রোজ সে এসে দাঁড়াবে রঙীন পৃথিবীর মুখোমুখি, মৃত্যুর অতল গহ্বর থেকে সে যখন একবার উঠে এসেছে তখন সে প্রাণভরে জীবন সুধা পান করবে।

'বউদি চল, এবার কিছু খেয়ে নিই। সামনের শ্রীমন্ত কেবিনটা বেশ ভালো। সস্তায় খুব ভালো জিনিষ দেয়।'

মনোতোষের কথায় জয়া তার দিকে তাকাল, তারপর একটু পরি-

হাসের সুরে বলল, 'এমন চমৎকার সন্ধ্যায় তোমার খাওয়ার কথা ছাড়া কিছু মনে পড়ল না ? তুমি তো আচ্ছা বর্বর।'

মনোতোষ বলল, 'কিন্তু সত্যিই ভারি ক্ষিদে পেয়েছে যে।'

এবার লজ্জিত হবার পালা জয়ার। বিকেল বেলায় স্টোভ জ্বেলে সে চা করে খেয়েছে, কিন্তু মনোতোষকে তো কিছু দেওয়া হয়নি। অফিস থেকে এসে এককাপ চা পর্যন্ত পায়নি ও। আজ ভারি অন্যমনস্ক ছিল জয়া, তাছাড়া বেরোবার তাগিদে আজ এসব খেয়ালই হয়নি। অথচ ওর জন্যে রুটি করা রয়েছে ঘরে। ভারি লজ্জা বোধ করল জয়া। শুধু লজ্জা নয়, ক্ষুধার্ত মনোতোষের জন্যে ভারি মমতা হোল তার। 'আচ্ছা চল, কোথায় তোমার শ্রীমন্ত কেবিন, দেখি গিয়ে তার শ্রীর বহর কতখানি।'

পুরো একটা টাকাও নেই ব্যাগটায়, কিন্তু যা আছে এতেই কুলিয়ে যাবে, নিজে কিছু খাবেনা। শুধু মনোতোষকেই খাওয়াবে।

অপরিসর রেস্টুরেণ্টের ভিতরে দুই সারি টেবিল। বেশির ভাগই ভরতি। কেউ কেউ খাচ্ছে কেউ বা খাওয়ার শেষে গল্প করছে। মাঝখান দিয়ে সরু এক চিলতে পথ। মনোতোষের পিছনে জয়া এগোতে লাগল। এরই মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে আড়চোখে কয়েকজনে তাদের দিকে তাকাল। একজন ফিসফিস করে সঙ্গীকে বলল, 'দেখেছিস ?' সঙ্গী বলল, 'হ্যাঁ দেখলুম। একটি পেয়ার বটে।'

মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল জয়ার। মনোতোষকে বলল, 'চল তাড়াতাড়ি চল।'

তের চৌদ্দ বছরের একটি ছোকরা এসে সাদরে আমন্ত্রণ জানাল, 'আসুন, ভিতরে আসুন। কেবিন খালি আছে।'

কেবিন মানে ছোট খোপ। সরু একখানা টেবিলের দু'পাশে দুখানা চেয়ার। জয়া পশ্চিমদিকে মুখ করে বসল। পিঠ ঠেকল কাঠের

পার্টিসনে। সামনের চেয়ারে বসা মনোতোষের দিকে চেয় জয়া বলল, 'ঈস যা গরম আর যা গন্ধ, তাড়াতাড়ি যা খাবার খেয়ে নাও মনোতোষ। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবেনা।'

অর্ডার নেওয়ার জন্তে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটি। তাকে ধমকে উঠল মনোতোষ, 'হ্যাঁ করে দেখছ কি, ফ্যানটা খুলে দাও।'

ছেলেটি বলল, 'ফ্যানটা খারাপ আছে বড়বাবু। একটু বাদেই মিস্ত্রী এসে ঠিক ক'রে দেবে।'

মনোতোষ বলল, 'এইজন্তেই বুঝি আমাদের এই কেবিনে আদর ক'রে ডেকে এনেছ।'

জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল 'চল অন্য ঘরে যাই। তোমার কষ্ট হচ্ছে।'

জয়া একটু হেসে বলল, 'না না ঘর বদলে আর লাভ কি। তুমি ওকে যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে দাও, আমার জন্তে কিছু নিতে হবে না, তুমি যা খাবে নাও।'

মনোতোষ বলল, 'তাই কি হয়। আমি কি শুধু নিজে খেতে এসেছি?'

তারপর বয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দু জায়গায় ডবল ডিমের অমলেট, একটা করে চপ, একটা ক'রে ফাউল কাটলেট, দুপীস ক'রে রুটি আর চা। যাও জলদি নিয়ে এসো।'

বয় বেরিয়ে গেলে জয়া আপত্তি ক'রে বলল 'একি করলে, অত কে খাবে। আমাকে কি নিজের মত রাক্ষস ভেবেছ?'

মনোতোষ সোল্লাসে বলল, 'তোমাকে আমি রাক্ষুসী বানিয়ে নেব। পাখির মত খেয়ে খেয়েই তো অসুখ বিসুখ হয়। ভয় নেই। আজ টাকা আছে আমার সঙ্গে, মাইনে পেয়েছি। তুমি আজ প্রাণভরে খাবে, আমি দেখব।'

জয়া বলল, 'আমি এসব কিছু খাবনা।'

খানিক বাদে দুটো বড় প্লেটে ফরমায়েস মত খাবার এনে রাখল রেস্টুরেন্টের ছোকরা। কাঁটা চামচ ঠেলে রেখে মনোতোষ হাত দিয়েই সুরু করল খেতে। কিন্তু জয়ার হাত নড়ে না, সে কাঁটা চামচও ছোঁয়নি।

মনোতোষ বলল, 'ওকি খাচ্ছ না যে।'

জয়া বলল, 'বলেছি তো আমি খাবনা। আমি বাইরের এসব খাবার তেমন রেলিস করিনে। তোমার খাওয়া হোক তারপর তোমাকে সব তুলে দেব।'

মনোতোষ বলল, 'ঈস, তুলে দিলেই আমি নিলাম আর কি। খাবেনা তো এত পয়সা ব্যয় করলাম কিসের জন্যে? খাবেনা বললেই হোলো, আহ্লাদ না?'

বলে মনোতোষ হঠাৎ নিজের খাওয়া ছেড়ে এঁটো হাতে জয়ার প্লেটের একটা চপের খানিকটা ভেঙে জয়ার মুখে জোর করে গুজে দিল।

জয়া যেন এই অসভ্যতা আশা করেনি। একটু চমকে উঠে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর রুদ্ধ স্বরে বলল, 'ছিঃ মনোতোষ।'

মনোতোষ প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেল, তাপপর দ্বিগুণ সাহসে বলল 'এর মধ্যে ছি ছি করবার কিছু নেই। আমি খাইয়ে দিচ্ছি, তুমি খাও। খেতেই হবে তোমাকে। না খেলে সত্যিই চেঁচামেচি করব, তা বলে দিলাম।'

মনোতোষ চপের টুকরো ভেঙে ভেঙে ফের জয়ার মুখে তুলে দিতে লাগল। বার বার ওর সেই স্থূল এঁটো আঙুলের স্পর্শে দুই ঠোঁট ভরে গেল জয়ার, দুই ঠোঁট জ্বলে যেতে লাগল।

আশ্চর্য, চেঁচামিচি করবার কথা তো জয়ারই, একটু টু-শব্দ করলেই রেস্টুরেন্টশুদ্ধ লোক তার সাহায্যের জন্যে ছুটে আসবে। কিন্তু সেই টু শব্দ টুকুই জয়ার মুখ থেকে বেরোল না।

মনোতোষ বলল, 'খাও, লক্ষ্মী মেয়েটির মত খেয়ে নাও। খেলেই তোমার রোগ সারবে, খেলেই তোমার শরীর ভালো হবে।'

চা দিতে এসে পর্দা একটু সরিয়েই রেস্টুরেন্টের ছোকরা জিভ কেটে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। তারপর বাইরে থেকে বলল, 'বাবু, আমি চা নিয়ে আসছি।'

জয়া বলল, 'ছেড়ে দাও, আমি নিজেই খাচ্ছি।'

মনোতোষ বলল, 'সব খাবে বল? ফেলে দেবে না?'

জয়া বাধ্য মেয়ের মত বল বলল, 'না।'

কথা দিয়েও সব খাবারই অবশ্য খেল না জয়া। রুটি পড়ে রইল, কাটলেটেরও অনেকখানি পড়ে রইল প্লেটে। চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল জয়া।

মনোতোষ আর বেশি পীড়াপীড়ি করল না, শুধু বলল, 'জিনিসগুলি ফেলে দেবে কেন দাও আমাকে।'

জয়া গম্ভীর মুখে বলল, 'তুমি নাও।'

মনোতোষ বলল, 'অমন নেওয়ায় আনন্দ নেই, তুমি নিজের হাতে তুলে দাও আমাকে।'

দেরি করলে কথা বাড়বে। তাই জয়া নিজের পাতের এঁটো খাবরাগুলি তুলে দিতে দিতে বলল, 'কারো এঁটো খেতে তোমার ঘেন্না হয় না?'

মনোতোষ বলল, 'না। ছেলেবেলা থেকে আমি এঁটো-কাঁটা খেয়েই মানুষ। আর তোমার এঁটো তো আমার কাছে অমৃত।'

জয়া আর কোন কথা বলল না। মনোতোষ যতক্ষণ খাওয়া শেষ করল, সে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে কাঠ হয়ে বসে রইল। কিন্তু ভিতরটা কেবল যেন কাঠই থাকতে চাইলে না। এই অশিষ্ট অভদ্র যুবকটির ওপর এক অসঙ্গত মমতা অনুভব করতে লাগল জয়া।

বিল চুকিয়ে দিয়ে বয়কে টিপ দিয়ে খোস মেজাজে বেরিয়ে পড়ল মনোতোষ। রাস্তায় নেমে বলল, 'চল এবার একটা ডবল ডেকারে উঠে বসি। একেবারে সামনের সীটে গিয়ে বসব।'

জয়া বলল, 'না।'

মনোতোষ বলল, 'সে কি যাবে না টালিগঞ্জ, মঞ্জুকে আনতে?'

জয়া রূঢ়কণ্ঠে বলল, 'এর পরেও কি তুমি আশা কর তোমার সঙ্গে কোথাও আমি যেতে পারি? কক্ষনো নয়, কোনদিনই নয়।'

দ্রুত পায়ে বাসার দিকে ফিরে চলল জয়া। এই মুহূর্তে এমন কঠিন তিরস্কার মনোতোষ আশা করেনি। হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না। মাথা নীচু করে সে জয়ার পিছনে পিছনে চলতে লাগল। মনে মনে এবার একটু ভয়ও হোলো তার। রাগের মাথায় বউটা সত্যি সত্যি বলে দেবে নাকি অমিয়দাকে? মনোতোষ অস্বীকার করবে না, স্বীকার করে বলবে সে বউদির সঙ্গে ঠাট্টা করছিল। তাদের তো ঠাট্টা-তামাসারই সম্পর্ক।

সদর দরজায় তালা লাগানো। তার সামনে অমিয় অপেক্ষা করছে। তাকে দেখে দুজনেই চমকে উঠল।

জয়া একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি যে।'

একটা দরকারী বই ফেলে গিয়েছিলাম। নিয়ে যাই। অফিসে বসে খানিকটা কাজ করা যাবে। তোমরা কোথায় বেরিয়েছিলে? সিনেমা টিনেমায় নাকি?'

জয়া বলল, 'না। এমনি একটু বেরিয়ে এলাম বাইরে থেকে। চল ভিতরে চল।'

অমিয় বলল, 'বাঃ দোর যে বন্ধ। আগে তালা খোল। তার পরে তো যাব।

লজ্জিত হয়ে তালা খুলে ফেল জয়া।

ঘরে এসে স্বামীকে বলল, 'ফিরেই যখন এসেছ, আজ আর দরকার নেই দরকারী বইয়ে, দরকার নেই নাইট ডিউটিতে।'

স্বামীর পাঞ্জাবির কোণটা হঠাৎ মুঠির মধ্যে চেপে ধরল জয়া। ঠিক আগেকার দিনের মত মুখে হাসি টেনে বলল, 'আজ আর তোমাকে যেতে দেব না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

অমিয় বলল, 'লক্ষ্মীটি তাই কি হয়। আজ সুব্রত আসতে পারবে না আগেই জানিয়ে গেছে। একা যতীনের ওপর চাপ পড়বে, ভারি অসুবিধে হবে কাজের। লক্ষ্মীটি ছেড়ে দাও।' স্ত্রীর পিঠে আলগোছে হাত বুলিয়ে দিল অমিয়। অভিমানে মুখ ভার করে জয়া দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ও-যে কি চাইছে তা অমিয় জানে। একবার ভাবল দেয়। ওর প্রত্যাশা পূরণ করে, রক্তবর্ণ অপূর্ব সুন্দর দু'টি ঠোঁট চুম্বনে চুম্বনে ভরে দেয় অমিয়। কিন্তু পরক্ষণেই নির্মল ডাক্তারের কথা ওর মনে পড়ে গেল। এখনো জয়া ভালো করে সেরে ওঠেনি। এখনো ওর পায়ে রয়েছে কোল্ড এ্যাবসেস। তার চিকিৎসা এখনো আরম্ভ করা হয়নি। এ সময় ওর আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেওয়া, তাকে বাড়িয়ে তোলা মোটেই সঙ্গত হবে না। রোগী তো কুপথ্য চাইবেই। কিন্তু কোন হিতৈষী কি তা দিতে পারে।

মৃদু অনুনয়ের ভঙ্গিতে অমিয় বলল, 'ছেড়ে দাও জয়া, যাই আমি। আর মাত্র এই চার পাঁচটা দিন—'

জয়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'যাও।'

না রাগ নয়, দুঃখ নয়, অমিয় বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন এক পরম তৃপ্তি বোধ করল জয়া। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে। অমিয় যে সত্যিই তার অনুরোধ রাখেনি তার জন্তে খুসি হয়েছে জয়া। যে অভিমান ক'রে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়েছিল, স্বামীর একটু আদর পাওয়ার জন্তে কাঙালপনা করছিল সে যেন আর একজন। জয়া নয়,

জয়ার ছদ্মবেশ। অমিয়র প্রত্যাখ্যান সেই খোলসের ওপর দিয়েই গেছে। ভিতরের জয়ার তাতে কিছু এসে যায়নি, বিন্দুমাত্র অপমান হয়নি।

জয়া ঘরে ঢুকে সশব্দে দোরে খিল দিল।

দিন দুই কাটল পূর্ণ অসহযোগের মধ্যে। স্বামীর সঙ্গে সামান্য ভদ্রতার সম্পর্ক রাখল জয়া, মনোতোষের সঙ্গে তাও নয়। তাকে জয়া সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে লাগল। যেন মনোতোষ সত্যি তার চক্ষুশূল। যেন তার ওপর জয়ার রাগ আর বিদ্বেষের সীমা নেই। কিন্তু মনোতোষ যখন হাঁটে তার পায়ের শব্দে জয়া নিজের অজ্ঞাতেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। মনোতোষ যখন হাসে, কথা বলে, সুধার তরঙ্গে জয়ার দু'কান ভরে যায়। জয়া সোজাসুজি তার দিকে তাকায় না বলেই আড়াল থেকেই তার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। বিদ্বেষ বিরাগের পটভূমিতে একি অপরূপ অনুরাগের ছবি আঁকা হয়ে যাচ্ছে জয়ার মনে। নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পায় জয়া। বই নিয়ে বসে, ঘর সংসারের কাজে হাত দেয়। মনোতোষের দিকে ফিরেও তাকায় না। যেন মনোতোষ বলে কেউ নেই পৃথিবীতে।

জয়ার এই বিরূপতা বিমুখতা দিন তিনেক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মনোতোষ, তারপর তৃতীয় দিনে মনোতোষ সোজা জয়ার সামনে এসে দাঁড়াল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। না উঠে যেয়োনা শোন। তোমাকে আমি বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। আমি একটা মেস ঠিক ক'রে এসেছি, কাল ভোরেই সেখানে চলে যাব। যদি চাও আজ রাত্রেও যেতে পারি।'

মাত্র এইটুকু কথা। কিন্তু ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কায় জয়া যেন এক অপরিসীম বেদনা বোধ করল। তবু নিজের ভাষায় ভঙ্গিতে সে

ব্যাকুলতা প্রকাশ হ'তে দিল না। পরম ঔদাস্যের সুরে বলল, 'তোমাকে তো কেউ যেতে বলেনি।'

মনোতোষ বলল, 'এর চেয়ে লোকে আর কেমন ক'রে বলে। ভাত জল? সে তো মানুষ কুকুর বিড়ালকেও দেয়। আমি এখানে থাকি তুমি যখন তা চাও না, তখন আমার চলে যাওয়াই ভালো।'

জয়া বলল, 'সে কথা আমাকে কেন, তোমার দাদাকে বললেই হয়।'

মনোতোষ বলল, 'তা হয় না। তুমি নিজেই জানো তা হয় না। আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু যাওয়ার আগে তোমার কাছে যে দেনা আছে তা শোধ ক'রে যাব। আর যে কথা কদিন ধরে বলি বলি করেও বলতে পারিনি আজ তা বলব।'

একটা নতুন গোলাপী রঙের ব্লাউজে বোতাম লাগাচ্ছিল জয়া। দাঁত দিয়ে বাড়তি সুতোটুকু কেটে ফেলে বলল, 'আমার শোনার সময় নেই।'

মনোতোষ বলল, 'কিন্তু দেনাটা? তা শোধ নেওয়ারও কি সময় হবে না তোমার?'

এবার হাসি পেল জয়ার, বলল, 'তা হবে। টাকা পয়সা যা নিয়েছ, কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দাও। আমাদের টাকার বড় অভাব।'

মনোতোষ বলল, 'সে দেনা যার কাছে আছে তাকে দেব। তোমার কাছে আমার টাকার দেনা নেই।'

জয়া মনোতোষের দিকে চোখ তুলে তাকাল, 'তবে কিসের দেনা?'

মনোতোষ পকেট থেকে কলাপাতার একটা বড় ঠোঙা বের করল।

জয়া বলল, 'কি ওতে?'

মনোতোষ বলল, 'ফুল। গন্ধে টের পাচ্ছনা? বেলফুলের মালা। নাও।'

জয়া বলল, 'কি করে নেব? দেখছ না আমার হাত আটকা?' তাকের ওপর ফুলদানি আছে, তাতে রেখে দাও।'

মনোতোষ বলল, 'আমি ফুলদানিতে ফুল রাখতে জানিনে।'

'তাহ'লে যেখানে খুসি রাখ।'

ফের ব্লাউজের বোতামের দিকে চোখ রাখল জয়া। সামনে ছিল, ঘুরে পিছনে গেল মনোতোষ। বিকেলে ভারি সুন্দর ক'রে খোঁপা বেঁধেছে জয়া। মনোতোষ পরম আদরে সেই কালো খোঁপায় সাদা মোটা গোড়ের মালা জড়িয়ে দিল।

মনোতোষের দুঃসাহসে মুহূর্তকাল আড়ষ্ট হয়ে রইল জয়া, তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, 'ওকি হোলো।'

মনোতোষ ফের সামনে এসে দাঁড়াল, 'তুমি তো বলেইছ যেখানে খুসি রাখ। আমি তাই খুসিমত রাখলুম। জানি এতে তুমিও খুসি হয়েছ।'

জয়া মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'না না, তুমি এবার ঘরে যাও মনোতোষ, ঘরে যাও।'

একটু কাল জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মনোতোষ আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

জয়া ভাবল মালাটা খোঁপা থেকে সরিয়ে ফেলে। কিন্তু সরানো হোল না। অমিয়র জুতোর শব্দ শোনা গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আঁচল তুলে মালা শুদ্ধু খোঁপাটা ঢেকে ফেলল জয়া। অমিয় তা দেখে হেসে বলল, 'ও আবার কি, হঠাৎ মাথায় আঁচল দিয়েছ যে?'

জয়া বলল, 'ইচ্ছে হোল দিলুম।'

অমিয় বলল, 'তা দাও, দিলে মাঝে মাঝে মন্দ দেখায় না কিন্তু।'

জয়া বলল, 'আমাকে ভালো দেখাল কি মন্দ দেখাল তাতে তোমার কি এসে গেল।'

অমিয় বলল, 'তা তো ঠিকই।'

ক'দিন ধ'রেই জয়ার মেজাজ ভালো যাচ্ছে না। অমিয় যে তা লক্ষ্য না করছে তা নয়। কোন সাংসারিক আলোচনায় সে আসে না, কোন রাজনৈতিক পরামর্শে সে যোগ দেয় না, সব সময়েই খিটখিট করছে। এবার একজন ভালো ডাক্তার ওকে দেখাতে হবে। দেখাতে হবে ওর পা'টা। এই নিয়ে আরো একদিন আলোচনা করেছে নির্মলের সঙ্গে। নির্মল বলেছে সমূহ ভয়ের কোন কারণ নেই। অমিয় সময় নিতে পারে। একটু ফুরসৎ পেলেই অমিয় ফের যাবে। সময়ই ঠিকমত করে উঠতে পারছে না অমিয়, নানা কাজের চাপ। তারপর আবার দেনা শোধের চিন্তা। যেসব বন্ধুর কাছে ধার ছিল তারা দু'একজন করে তাগিদ দিতে শুরু করেছে। মাস কয়েক খুব খেটে সকলের দেনার শেষ পাইটি পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়ে অমিয় এবার হাওয়া বদলাতে যাবে। জয়াকে নেবে সঙ্গে। নিজের শরীরেও যেন আর কুলাচ্ছে না।

খেয়ে দেয়ে ফের বেরিয়ে পড়ল অমিয়। যাওয়ার সময় ডেকে মনোতোষকে বলে গেল, 'এই মনো শোন্। ঘুমুচ্ছিলি নাকি ?'

'না।'

'সাবধানে থাকিস। পাড়ায় নাকি খুব চুরিটুরি হচ্ছে। একেবারে ঘুমিয়ে অসাড় হয়ে থাকিসনে যেন। মাঝে মাঝে জেগে সাড়া দিস। অবশ্য আমার আছেই বা কি আর চোরে নেবেই বা কি। তবু—।'

বলে একটু হাসল অমিয়। তারপর বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। মনোতোষ ঝুঁকে পড়ে গলির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অমিয়কে যখন আর দেখা গেল না ফিরে এসে সন্তর্পণে সদরের হুড়কো বন্ধ করল। নিজের ঘরে গেল না, গিয়ে ঢুকল অমিয়র ঘরে।

দু'জনের ঘরেই দৈন্যের ছাপ। তবু অমিয়র ঘরের চেহারা আলাদা। তার ঘরে আছে লক্ষ্মী, আছে লক্ষ্মীশ্রী।

জয়া বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা বইয়ের পাতা উলটাচ্ছিল, মনোতোষকে দেখে চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি উঠে বসল, 'ব্যাপার কি ?'

মনোতোষ বলল, 'ব্যাপার কিছুই না। সাবধানে জেগে টেগে থেকো। তাই বলতে এলাম। অমিয়দা কি বলে গেলেন শুনেছ তো।'

সদরে অমিয় আর মনোতোষের কি কথা হয়েছিল ঘরের ভিতর থেকেই তা কানে গিয়েছিল জয়ার।

একটু চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'শুনেছি। তুমি যাও, ঘরে যাও মনোতোষ।'

জয়ার গলা কাঁপছে। এ যেন আদেশ নয়, আকুতি। দয়া করে তুমি যাও মনোতোষ। দয়া করে চলে যাও।

কিন্তু সংসারে মনোতোষকে দয়া করেছে কে, যে সে দয়া করবে। কেউ দয়া করেনি, কেউ না। কাকা নয়, কাকীমা নয়, মনিব নয়, কেউ নয়। আর সব চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর ব্যবহার করছে জয়া। কাছে টেনে এনে বলছে, যাও। কিন্তু আজ আর যাবে না মনোতোষ, আজ আর সে যেতে আসেনি। যেতে সে পারবে না। ঘুমুতে গেলে সে ঘুমুতে পারবে না। তার শরীরের মধ্যে কি যেন কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। টি-বি-র পোকা কি এর চেয়েও খারাপ, এর চেয়েও বিষাক্ত।

অমিয়র চেয়ারটা জয়ার সামনে টেনে নিয়ে তার কাছে আরো এগিয়ে বসল মনোতোষ, আস্তে আস্তে বলল, 'যাবই তো। একেবারেই চলে যাব। দেনা শোধ হয়ে গেছে। শুধু একটা কথা বাকি আছে বলবার। ক'দিন ধরেই বলব বলব ভাবছি। কিন্তু—।'

জয়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'বলে ফেল মনোতোষ। তুমি আমাকে খুব ভালোবাস, এই তো ?'

মনোতোষ একটু থমকে গেল, একটু ঘাবড়ে গেল, তারপর ঘাড় সোজা করে বলল, 'না, শুধু তাই নয়। সে কথা তো আছেই, কিন্তু

তা বলতে আজ আমি আসিনি। আরো একটা গোপন কথা আছে।'

জয়া বলল, 'এ কথার চেয়েও গোপন ? বল।'

মনোতোষ বলল, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি কি না বাসি তা বলার কোন দরকার নেই। কিন্তু অমিয়দা যে তোমাকে আর ভালোবাসে না তা না জানিয়ে আমি এখান থেকে যেতে পারছিনে। তোমার কাছে তা বলতেই হবে। চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে তোমার।'

জয়া আর একবার চমকে উঠল, 'চিকিৎসা ? কিসের চিকিৎসা ? কিসের চিকিৎসা মনোতোষ ?'

মনোতোষ বলল, 'তোমার পাযেব। নিজের পাটা দেখেছ ? তোল, পাটা তোল তো।'

বলে হাত দিয়ে নিজেই জয়ার ডান পাটা তক্তপোষের ওপর তুলে দিল মনোতোষ। তারপর এ্যাবসেসটার ওপব আঙ্গুল রেখে বলল, 'এটা কি জানো ?'

জয়া ভয়ে ভয়ে দেখল গোটাটা আরো বড হয়েছে। ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি ওটা ?'

মনোতোষ বলল, 'টি-বির টিউমার। ওরা তোমাকে বলেনি। তোমার কাছ থেকে গোপন করেছে। তাবপর বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখেছে তোমাকে। ফেলে রেখে আগের চিকিৎসার ধার শোধ করছে। আমি হলে এমন করতুম না। তোমাকে কাঁধে নিয়ে ভিক্ষে করতুম। ভিক্ষে করেও তোমার চিকিৎসা করাতুম। তুমি আমার কাছে সব চেয়ে দামী। তোমাকে আমি মরতে দেব না, কিছুতেই মরতে দেব না।'

জয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি ?'

তারপর নিজেই নিজের কথার জবাব দিল, 'সত্যি।'

এবার বুঝতে পারছে জয়া। এবার অমিয়র ব্যবহার, নির্মলের ব্যবহার তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ইসারা এখন তার কাছে পরিষ্কার। সর্বাণীর সঙ্গে অমিয়র ঘনিষ্ঠতার অর্থও এবার বোঝা যাচ্ছে। যে বাঁচবে না তাকে নিয়ে আর কেন। যে বেঁচে রয়েছে তাকে নিয়ে নতুন করে বাঁচ। কিন্তু শুধু কি অমিয়ই বাঁচবে? মরবার আগে জয়া কি আর একদিনের জন্যেও বেঁচে যেতে পারবে না?

জয়া আস্তে আস্তে মনোতোষের হাত ধরল, 'তুমি কি করে জানলে?'

মনোতোষ বলল, 'আমি শুনেছি। আড়াল থেকে নির্মল ডাক্তারকে কথা বলতে শুনেছি। মোড়ের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। আমার মুখে ছিল বিড়ি, সরে একটু আড়ালে গেলাম। ওরা লক্ষ্য করেনি।'

'আগে বলনি কেন মনোতোষ? আগে কেন বলনি?'

মনোতোষ বলল, 'ভেবেছিলাম অমিয়দা'ই বলবে। অমিয়দাই তোমাকে নিয়ে যাবে বড় ডাক্তারের কাছে।'

জয়া বলল, 'না মনোতোষ, ওরা আর নেবে না, ওদের নেওয়ার আর শক্তি নেই, ওরা বোধহয় বুঝতে পেরেছে নিয়ে লাভও নেই কোন।'

হঠাৎ জয়া মনোতোষকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরল, 'তুমি আমাকে বাঁচাও মনোতোষ। ভিক্ষে করে পারো, চুরি করে পারো আমার চিকিৎসা করাও। আমাকে বাঁচাও। আমি মরতে চাইনে, কিছুতেই মরতে চাইনে।'

মনোতোষ ওর দীর্ঘ শক্ত সবল দু'খানা বাহু দিয়ে জয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে মরতে দেবও না।'

দোর বন্ধ হোল। আলো নিবল ঘরের। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে ভরে গেল। তা যাক। জয়ার সামনে আলো জ্বলছে। জীবনের

আলো। মনোতোষ তাকে বাঁচাবে। মনোতোষ তাকে বাঁচিয়েছে। অন্তত কয়েকটি মুহূর্তের জন্তেও বাঁচিয়েছে তাকে। বাঁচা? হ্যাঁ, বাঁচা বইকি। তার দেহ, লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে তার বুভুক্ষু তৃষিত দেহ, দেহের প্রতিটি রোমকূপ এর জন্তেই তো অপেক্ষা করছিল, এই অমৃত সিঞ্চনের জন্তে।

একটু বাদে জয়া বলল, 'আমাকে তোমার ঘৃণা করল না মনোতোষ? আমার রোগের জন্তে তোমার ভয় করল না?'

মনোতোষ একটু চুপ করে রইল। বুঝি এবার সত্যিই ভয় হোল ওর, কিন্তু পরমুহূর্তেই কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'না আমার ভয় নেই, আমি কিছু গ্রাহ্য করিনে। আমার কাকীমারও তো আছে বোন টি-বি। তাই নিয়ে ঘর সংসার করছে। বছর বছর ছেলে হচ্ছে মেয়ে হচ্ছে। তাতে কা হয়েছে কাকার? ঘোড়ার ডিম হয়েছে। আমারও কিছুই হবে না। যাদের হয না, তাদের কিছুতেই কিছু হয় না, এ আমি কত দেখেছি। আর যদি হয়ই তাতেই বা দুঃখ কি, তোমাকে তো পেলাম। এ জীবনে কেউ আর আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না। মরলে পর নেবে। তোমাকে যদি না বাঁচাতে পারি এক সঙ্গে ভুগে ভুগে মরব, এক হাসপাতালে পাশাপাশি শুয়ে দুজনে দুজনকে দেখতে দেখতে মরব। পাশাপাশি চিতায় একসঙ্গে জলব; কিন্তু তোমাকে ছেড়ে জীবন ভরে একা একা জলে পুড়ে মরতে পারব না।'

নিবিড়ভাবে জয়াকে আর একবার আলিঙ্গন করল মনোতোষ। তারপর বলল, 'যারা বেশি খুঁৎখুঁতে, যাদের শুচিবাই বেশি তাদের এসব হয়। তাদেরই এসব হোক। আমাদের এতে কিছু হবে না তুমি দেখ।'

জয়া হঠাৎ চমকে উঠল। অমিয়র চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের

সামনে। আর চোখের নিচে সেই জেগে ওঠা দুখানা হাড। চোখ বুজল জযা। তাবপব নিজেকে ছাডিযে নিতে নিতে বলল, 'যাও, তুমি যাও।'

উঠে যেতে মনোতোষ এবার আব আপত্তি করল না।

ফের আলো জ্বলল ঘরে। আব সেই আলোর মধ্যে সমস্ত দেহ সমস্ত মন জযার বি বি কবে উঠল। 'ছি ছি ছি, একি হোল, একি কবলাম! আমি কোথায লুকোব! এ মুখ আমি দেখাব কি কবে!'

নিজের মুখ নিজেবই আগে দেখতে হোল। ছাযা পডল আযনায। কিন্তু সে মুখেব দিকে আব তাকানো যায না, সে আযনাটা উলটে রাখল তাডাতাডি। কিন্তু নিজেকে বাখবে কোথায? ঘরেব আলো নিবিয়ে দিল। তবু নিজেব অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে পারল না। বিছানায হুমডি খেযে পডল। বালিশ ভিজে গেল জলে।

তারপর অনেকক্ষণ ধবে অশ্রু বর্ষণেব পব জযা শান্ত, স্থির হযে সমস্ত ব্যাপাবটা ভাবতে চেষ্টা কবল, কী হযেছে? কী এমন হয়েছে? অমিয না জানতে পাবলেই হোল। মনোতোষকে এখান থেকে সবে যেতে বললেই হোল। কিন্তু মনোতোষ কি যাবে? সে কি সহজে ছাডবে? সে কি শোধ নেবে না? সব সময ভযে ভয়ে থাকতে হবে। এই বুঝি জেনে ফেলল অমিয, এই বুঝি জেনে ফেলল। না, তেমন অস্বস্তি নিযে তেমন আশঙ্কা নিযে জযা থাকতে পারবে না। চিরজীবন চোরেব মতন ভয়ে ভযে থাকতে পারবে না। তাব চেয়ে জযা অমিয়কে বলবে। সব অপরাধ স্বীকার করবে। কিন্তু তারপর? অমিয় যদি ক্ষমা না করে? এই সমাজে এ অপরাধ কি কোন স্বামী ক্ষমা করতে পারে? পারে না। অমিয়ও ক্ষমা করার ভাণ করবে,

ক্ষমা করবে না। ফের তার চিকিৎসা করাবে, তার জন্যে টাকা খরচ করবে, লোকের কাছে আরো দেনা করবে; কিন্তু তাকে ছোঁবে না। তার অসুখ সারলেও ছোঁবে না। এখনও তাকে ছোঁয় না অমিয়। তবু এ না ছোঁয়া সহ্য হয়। কিন্তু সেই না ছোঁয়া কি সহ্য হবে? চিরজীবন ধরে তা কি সইতে পারবে জয়া? না তা পারা যাবে না। তার চেয়ে গোপন করে যাবে সেই ভালো; কিন্তু গোপন করায় সেই ভয়, সেই আশঙ্কা, সেই হীনতা। চিরজীবন ধরে এই লোভ আর ভয়ের পালা চলবে। শান্তিতে থাকবার লোভে কোনদিন একথা স্বামীর কাছে স্বীকার করতে পারবে না জয়া, কিন্তু ধরা পড়বার ভয়, চরম অশান্তির ভয় সব সময় লেগেই থাকবে।

না, এমন করে বাঁচতে পারবে না জয়া, বাঁচতে পারবে না। বাঁচবার জন্যে নতুন পথ তাকে খুঁজতে হবে, নতুন ঘর তাকে বাঁধতে হবে। এ ঘরে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু পাগল হতে সে চায় না। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চায়। মনোতোষ তাকে বাঁচাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেই তাকে বাঁচাক।

স্যুইচ টিপে জয়া ফের আলো জ্বালালো ঘরে। এবার আর লজ্জা করল না। এবার সে মনস্থির করে ফেলেছে। যা করেছে সব তার নিজের দায়িত্ব। সে কাজের ভালো মন্দ সব ফলাফল সে নিজে ঘাড় পেতে নেবে। কারো দয়া চাইবে না, কারো কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে না, মাথা সোজা করে বলবে, 'যা করেছি বেশ করেছি। এখন থেকে আমি আর একজনের সঙ্গে ঘর করব। সে ঘর সুখের ঘর না হোক, সম্মানের ঘর হবে।'

কিন্তু এখানে চোরের মত, চুরি করা সম্মান নিয়ে প্রতিমুহূর্তে হাতকড়ি পরবার ভয়ে সে দিন কাটাতে পারবে না।

দেরাজ খুলে কলম বের করল জয়া। তারপর এক টুকরো কাগজে

লিখল, 'আমি চললুম। মনোতোষের সঙ্গেই চললুম। আজ যা ঘটে গেল তাতে তোমার ঘরে থাকবার আর আমার অধিকার নেই। আমি থাকতেও চাইনে। কিন্তু মনে রেখ, এর জন্মে শুধু আমি দাষী নই। তুমিও, তুমিও।'

স্বাক্ষর, সম্বোধন, তারিখ সবই বাদ দিল জয়া। ওসব নিষ্প্রয়োজন।

গরমের জন্মে দোর খুলেই শুয়েছিল মনোতোষ। তারও ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ বাদে একটু বুঝি তন্দ্রার মত এসেছিল। জযাব হাতের ছোঁযায চমকে উঠে বলল, 'কে ?'

জয়া বলল, 'ওঠো, আমি।'

মনোতোষ ধাবড়ে গিযে বলল, 'কি ব্যাপার। অমিয়দা এসেছে নাকি ?'

জযা একটু হাসল, 'না, তার আসাব আগেই পালাতে হবে। শিগগিব ওঠো। আমি তৈরী। তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হযে নাও।'

মনোতোষ খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'পাগল হলে নাকি তুমি ? এত রাত্রে কোথা[illegible]র ? কোথায নিযে যেতে চাও তুমি ?'

জয়া বলল, 'ভয নেই। খুব বেশি দূরে যাব না। অত টাকা কোথায়। আমরা এই শহরেই থাকব। এই শহরের ভিড়েই মিশে থাকব আমরা।'

বিমূঢ়ের মত জয়ার মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে মনোতোষ বলল, 'তুমি কি বলছ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিনে। কোথায় যেতে চাও তাই বল ?'

জয়া বলল, 'এখনকার মত এই ঘরের বাইরে। যে কোন জায়গায়।'

মনোতোষের বাস্তববোধ জয়ার মত নষ্ট হয়নি। সে বলল, 'ঘরের বাইরে মানে তো পথ। এত রাত্রে তোমাকে সঙ্গে করে পথে বেরোলে পুলিশে ধরবে যে। টানতে টানতে হাজতে নিয়ে যাবে।'

জয়া বলল, 'বেশ হাজতেই যাব। দুজনে মিলে চিতায় উঠতে চেয়েছিলে আর হাজতে যেতে পারবে না?'

মনোতোষ বলল, 'দরকার হলে পারব না কেন। কিন্তু আজই যেতে হবে তার কি মানে আছে।'

জয়া বলল, 'আছে। এবাড়িতে আমাদের আর থাকবার অধিকার নেই।'

মনোতোষ বলল, 'অধিকার কেড়ে নিচ্ছে কে আমি তো বুঝতে পারলাম না। অমিয়দা আসবে তো সেই ভোরে, এসে কিছুই টের পাবে না। তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন।'

জয়া বলল, 'ছিঃ। একথা বলতে তোমার লজ্জা করল না মনোতোষ? তুমি না পুরুষ মানুষ?'

মনোতোষ বলল, 'বেশ। বল কি করতে চাও?'

জয়া বলল, 'চলে যেতে চাই।'

মনোতোষ বলল, 'পারবে যেতে? অমিয়দাকে ছেড়ে পারবে থাকতে?'

জয়া বলল, 'পারতে হবে, তুমি আমার সঙ্গে না আস আমি একাই যাব।'

মনোতোষ বলল, 'না না চল, আমিও আসছি। কিন্তু ভাবছি এই সখ তোমার কতদিন থাকবে। আমি গোমুখ্যু! চল্লিশ টাকা মাইনেয় সাইকেল পিয়নী করি। তুমি বি-এ পাশ করা মেয়ে—'

জয়া অধীর হয়ে বলল, 'ওসব কথা থাক মনোতোষ। যেতে যদি হয়, চল। না হলে আমি একাই বেরুলাম।'

মনোতোষ বলল, 'একা? না না, একা তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না। আমি যাব তোমার সঙ্গে, চিরজীবন থাকব। চিরজীবন তোমাকে মাথায় করে রাখব।'

দ্রুতহাতে নিজের বিছানা সুটকেস গুছিয়ে নিল মনোতোষ। তারপর জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কিছু নিলে না? এক কাপড়েই চললে?'

জয়া বলল, 'হুঁ।'

মনোতোষ বলল, 'নিলে পারতে। আজকাল শাড়ির যা দাম। আচ্ছা চল।'

যাওয়ার আগে অমিয়দার কথাটি মনে পড়ল মনোতোষের। বেচারা অনেক উপকার করেছে। অসময়ে দেখেছে। চাকরি পর্যন্ত জুটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উপায় কি? সেই অমিয়দার নিজে দেখেশুনে ভালোবেসে বিয়ে করা, বি-এ পাশ করা বউ যদি নিজের ইচ্ছায় তার সঙ্গে পালাতে চায় তো মনোতোষ কি করতে পারে। এমন লোভ সামলাবার শক্তি তার নেই। অমন যে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সেও পারেনি। সেও দ্রৌপদীর ভাগ নিয়েছিল। তার চেয়ে অর্জুনকে দ্রৌপদী বেশি ভালোবাসত বলে মনে মনে যুধিষ্ঠিরেরও দুঃখ, রাগ, হিংসে কম ছিল না, তা সে মহাপ্রস্থান পর্বে বেশ খোলাখুলি ভাবেই বলে গেছে। কিন্তু দুঃখ করলে হবে কি। দুঃখ করে লাভ নেই। সেই দ্বাপর যুগে যা ছিল কলি যুগেও তাই আছে। সব যুগেই দ্রৌপদীরা যুধিষ্ঠিরের চাইতে অর্জুনকে বেশি ভালোবেসেছে। সংসারে তাই নিয়ম। অমিয়দা এম-এ-ই পাশ করুক আর যাই করুক, যত ভালোমানুষই হোক তার ওই রোগা পটকা চেহারা নিয়ে এমন স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী বউকে কিছুতেই ঘরে ধরে রাখতে পারত না অযত্নে অযত্নে হয় এ বউ মরে যেত, না হয় আর কারো

পালিয়ে যেত। হয় তো ওই নির্মল ডাক্তারটার সঙ্গেই পালাত। তার চেয়ে মনোতোষের সঙ্গে যে যাচ্ছে সে একরকম ভালোই। একেবারে কুলের বাইরে তো গেল না, জ্ঞাতিগোষ্ঠীর ঘরেই রইল।

ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে, আছে রিক্সা। জয়াকে নিয়ে রিক্সায় চাপল মনোতোষ। এই মাথা-খারাপ বউটাকে নিয়ে কোথায় যায় এখন। মনে পড়ল বেলেঘাটার চুণাপট্টীর বস্তী। সেখানে থাকে হরলাল জানা। কাজ করে চুণের আড়তে। মনোতোষের বন্ধু। বয়সে অবশ্য অনেক বড। বিয়েটিয়ে করেছে। ছেলেমেয়েও হয়েছে। তার পাশের একখানা ঘর খালি হয়েছে ক'দিন আগে বলেছিল। রিক্সা-ওয়ালাকে দিল সেই ঠিকানা। বলল, 'ট্যাক্সীর মত চালিয়ে যাবি। ভাড়া যা লাগে দেব। তার ওপর চার আনা বকশিস।'

রিকসায় উঠে হঠাৎ জয়ার খেয়াল হোল। একি করছে সে। এ কোথায় যাচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় কোন সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

মনোতোষকে কাতর স্বরে বলল, 'রিক্সা ফেরাও মনোতোষ। ফিরে চল শিগগির। এখনো সময় আছে।'

কিন্তু মনোতোষের মনে ততক্ষণে নেশা ধরেছে। ভারি সুন্দরী মেয়ে, ভারি সুন্দরী। যেমন সুন্দরী তেমনি শিক্ষিতা। এ রত্ন যখন তার হাতে এসে পড়েছে তখন কিছুতেই সে ছাড়বে না। অমিয়দা তো দূরের কথা এর জন্যে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, যমের মুখ থেকে একে ফিরিয়ে আনবে। বহু পুণ্যের ফলে এমন মেয়ে পাওয়া যায়। পাপ নয়, কিছুতেই পাপ নয়। পাপী হলে কি এমন দেবকন্যাকে মনোতোষ পেত। একে তো সে হরণ করেনি। এ কন্যা নিজে স্বয়ম্বরা হয়েছে।

হয়, জয়ার সর্বাঙ্গ কাঁপছিল। মনোতোষ তাকে শক্ত করে আঁকড়ে

ধবল, কিন্তু কথা বলল নরম গলায়। দরদ দিয়ে বলল, 'ভয় পেয়ো না। প্রথম প্রথম অমন একটু ভয় করবেই। দুঃখ হবেই, কিন্তু তারপরে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যতক্ষণ আছি তোমার কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই তোমার। আমি না খেয়ে তোমাকে খাওয়াব। আমি ভিক্ষে ক'রে ক'রে তোমার রোগের চিকিৎসা করাব। তোমার ভয় কিসের।'

অসহায় তের চৌদ্দ বছরের একটি গ্রাম্য মেয়ের মত মনোতোষের বুকের সঙ্গে লেগে রইল জয়া। তার বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস, ব্যক্তিত্ব সব এক গভীর অন্যায়বোধের কাছে লোপ পেয়েছে। নিজের আকস্মিক হঠকারিতায় নিজেই বিমূঢ় স্তম্ভিত হয়ে গেছে জয়া। তার বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছে। বুঝি জীবনীশক্তিও।

একটা জায়গায় এসে রিক্সা আর চলল না। রিক্সাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে পায়ে হেঁটে এগুতে লাগল মনোতোষ।

কাঁচা নর্দমার ধার দিয়ে দিয়ে সরু গলি। বিশ্রী দুর্গন্ধে ভরা অন্ধকার। মনোতোষ দেশলাইর কাঠি জেলে এগিয়ে চলল, বলল, 'কোন ভয় নেই! আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো। হাত ধরব?'

জয়া বলল, 'না। চল।'

কয়েকটা মাটির বাড়ি পেরিয়ে যে বাড়িটার সামনে এসে মনোতোষ কড়া নাড়ল, খানিক দূরের একটা গ্যাসের আলোয় দেখা গেল তার চেহারা অনেকটা ভালো।

একটু বাদে ত্রিশ বত্রিশ বছরের কালোপানা একটি লোক হ্যারিকেন হাতে বেরিয়ে এসে বলল, 'এই, কে রে? কে ওখানে?'

'আমি হরো কাকা। মনোতোষ। পারুলিয়ার মনোতোষ মান্না।'

হরলাল বলল, 'ও, মনোতোষ, তাই বল। এত রাত্রে যে। সঙ্গে কে ও? হ্যাঁ রে কার ঘরের সর্বনাশ ক'রে এলি।'

কি বলবে না বলবে মনোতোষ তা রিক্সায় আসতে আসতে ঠিক ক'রেছিল। তালিম দিতে দিতে এসেছিল জয়াকেও। জয়ার কানে সে সব কথার কতটা কি গেছে, কে জানে।

মুহূর্তের জন্যে একটু যেন ঘাবড়ে গেল মনোতোষ, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলল, 'নাও বিড়ি নাও। সর্বনাশ সর্বনাশ কি বলছ হরোকাকা। এই শুভদিনে ওসব অলুক্ষুণে কথা বলতে নেই। দেখছ না সিঁথিতে সিঁদুর। পায়ে আলতা। ও তোমার ঘরের বউ হরোকাকা।'

হরলাল তবু সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, 'বউ? সত্যি বলছিস! চেহারা টেহারা দেখে ভদ্রলোকের মেয়ে বলে মনে হচ্ছে যে।'

মনোতোষ বলল, 'আহা ভদ্রলোকের মেয়েই তো। তুমিই বা কোন অভদ্র ঘরের মানুষ? গোবিন্দ জানার ছেলে না তুমি? তিন গাঁয়ের মাতব্বর ছিল যে। এখনই না হয় তোমার এই অবস্থা।'

হরলাল খুসি হ'য়ে বলল, 'তা তো ঠিকই, তবে শেষে একটা কেলেঙ্কারিটারি না হয় সেই ভয় করে। এটা গৃহস্থ বাড়ি। বাঙাল দেশের আরো চার পাচ ঘর ভাড়াটে আছে। গোলমাল-টোলমাল হবে না তো শেষে?'

মনোতোষ বলল, 'না, এখনো বুঝি তোমার সন্দেহ যাচ্ছে না। তাহ'লে পায়ে হাত দিয়েই বলি, বউ, তুমিও হরোকাকার পায়ে হাত দিয়ে বলে দাও। তাতে জাত যাবে না। সামনে বিড়িটা আসটা খাই রঙ্গ রসিকতাও করি। কিন্তু গ্রাম সম্পর্কে কাকা। গুরুজন। তোমার হোল গিয়ে খুড়োশ্বশুর।'

জয়া নিজে এগুলো না। কিন্তু মনোতোষ নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলল হরলালের। ধুলো সবটুকু নেওয়া হ'লে হরলাল বলল, 'থাক থাক, চল ভিতরে। এসো বউমা।'

মনোতোষ বলল, 'সেই ঘরখানা খালি আছে তো ?'

হরলাল বলল, 'আছে আছে। তোর বউকে কি উঠানে দাঁড় করিয়ে রাখব ভেবেছিস। আয় ভিতরে আয়।'

মনোতোষ আর জয়া হরলালের পিছনে পিছনে বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

মনোতোষ বলতে বলতে চলল, 'চিনতে তোমার ভুল হয়নি হরোকাকা। শত হ'লেও জহুরীর চোখ তো। ভদ্রলোকের মেয়েই বটে। সেইজন্মেই এত বেশি বয়স অবধি আইবুড়ো ছিল। স্কুলেও দু'চার ক্লাস পড়েছে। অমিয় দাসকে চেনো ? সেই যে কাসুন্দিয়ার অমিয় দাস ? সম্পর্কে মামাতো ভাই হয় আমার। সে যে বংশে বিয়ে করেছে এও সেই বংশেরই মেয়ে। নিকটজ্ঞাতি, বলতে গেলে অমিয়দাই যোগাযোগ করে দিয়েছে। তার দৌলতেই পেয়ে গেছি।'

হরলাল বলল, 'সত্যি না কি ? তোরাই ভাগ্য করে এসেছিলি রে। আচ্ছা, ধীরে সুস্থে সব শুনব। এই তোদের ঘর।'

একখানা ঘরের তালা খুলে দিল হরলাল। বলল, 'বাড়িওয়ালা বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে চাবি দিয়ে গেছে। আগের ভাড়াটেকে চক্রান্ত ক'রে আমিই তুলে দিয়েছি কিনা। ভাড়া প্রায়ই বাকি রাখত। তবু ভাড়াটে তোলা তো সোজা কথা নয়। আমি পিছনে না লাগলে পারত না। মাস মাস ভাড়াটা কিন্তু তুই দিয়ে দিস বাপু। বাকি টাকি রাখিস নে। আমার মুখ রাখিস। আর এক মাসের ভাড়া বেশি দিতে হবে। না না সেলামি টেলামি কিছু না। এই সাহায্য হিসাবে। বুঝেছিস ?'

মনোতোষ বলল, 'বুঝেছি। ভাড়া কত ?'

হরলাল বলল, 'ঘর হিসেবে ভাড়া কিছু নয়, পনের টাকা।'

মনোতোষ বল, 'পনের ? বল কি ! আচ্ছা তাই দেব।'

'এসো ঘরে এসো।'

সাদরে সগর্বে জয়াকে আমন্ত্রণ জানাল মনোতোষ। বিছানা আর হাতে স্যুটকেস ঝুলিয়ে নিজে আগে ঢুকে পড়ে ফের ডাকল, 'এসো।'

জয়া একটু ইতস্তত করল, একটু দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

রাত আড়াইটেয় সেদিন কাজ শেষ হোল। অমিয় সহকর্মী সুব্রত রায়কে বলল, 'যাব নাকি চলে ?'

সুব্রত বলল, 'যাও না। আর পেটে ক্ষিদে মুখে লাজে দরকার কি। আজ বাসায় তোমার মন পড়ে রয়েছে তা বুঝতে পেরেছি।'

কথা মিথ্যে নয়, আজকে মাঝে মাঝে একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়ছিল অমিয়, ওরও চোখে পড়েছিল জয়ার খোঁপায় জড়ান বেলফুলের মালা। জয়া যে অভিমান ক'রেই সে মালা আঁচলে ঢেকেছে তা তার বুঝতে বাকি ছিল না। তবু মনের কথা মনেই চেপে রেখেছে অমিয়, ভেবেছে আসার সময় বলে আসবে। কিন্তু তাও হোল না। তেমন সুযোগ জুটল না একবার। তার বদলে মনোতোষকে খানিকটা সুপরামর্শ দিয়ে এল। সত্যি এই একটা দেড়টা বছর ধরে ফুলের কথা অমিয় যেন ভুলেই গেছে। না কি তারও আগে থেকে ভুলেছে। অনেক কাল—অনেক কাল ধ'রে জয়াকে সে নিজের হাতে ফুল কিনে দেয়নি। তখন রোজই ফুল কিনত। পয়সায় না কুলালে অন্য দরকারী জিনিস বাদ দিয়েও কিনত। তা নিয়ে জয়াও কি কম কথা শুনিয়েছে। আজ সেই ফুল জয়া নিজের হাতে কিনেছে। সবটা নিজের খোঁপায় না জড়িয়ে কিছু অমিয়কে দিলেও তো পারত। বলতে

পারস্ত, 'তোমার কাজের রাত এই ফুলের কবিতায় ভরে দিলুম। আমার মনের কথা ভরে দিলুম ফুলের মধ্যে। বার বার তোমাকে তা আনমনা করুক।'

কবিতা তো এক সময় জয়াও লিখত। আজ কি সবই সে ভুলে গেছে? কিন্তু জয়া ভুললেও অমিয় ভোলেনি। রাত আড়াইটার সময় সেই কথা অমিয় স্ত্রীকে বলতে চলল। যানবাহন কিছু নেই, পকেটে পয়সা নেই রিক্সা ডাকবার। সারাটা রাস্তা হেঁটে চলল। পেরুল বউবাজার স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীটে পড়ে খানিকটা এগিয়ে ডাইনে মোড় নিল। অদ্ভুত ভালো লাগতে লাগল অমিয়র। যেন প্রথম অভিসারে চলেছে।

সদরের কাছে এসে অমিয় থমকে দাঁড়াল। দরজাটা বাইরে থেকে ভেজানো। একটু ফাঁক করা। ব্যাপার কি, শোয়ার সময় মনোতোষ কি সদর বন্ধ করতে ভুলে গেছে। এত করে সাবধান করে দেওয়ার পরেও ওর কিছু কানে গেল না। ভালো করে আজ ওকে বকুনি লাগাতে হবে। ভিতরে ঢুকে সাবধানে সদর বন্ধ করল অমিয়, তারপর গেল নিজের ঘরে।' ভেবেছিল কত ডেকে ডেকেই না জানি জয়াকে তুলতে হবে। কিন্তু দোর খোলা দেখে একটু অবাক হোল। হয়তো গরমের জন্যেই খুলে রেখেছে। ঘর অন্ধকার। প্রথমে আলো জ্বালল না। পা টিপে টিপে গেল তক্তপোষের কাছে। আস্তে আস্তে ওর গায়ে হাত রাখবে। চুম্বনে চুম্বনে ওর ঘুম ভাঙাবে। কিন্তু হাতে ঠেকল শূন্য তক্তপোষ। জয়া নেই। এবার সুইচ টিপে আলো জ্বালল অমিয়। শুধু তক্তপোষই নয়, ঘরও শূন্য। আশ্চর্য, গেল কোথায় জয়া। বাথরুমে-টুমে ঢুকল নাকি। না কি ঘুম না আসায় মনোতোষের ঘরে গিয়ে গল্প করছে। অমিয় গেল মনোতোষের ঘরে। সে ঘরও শূন্য। ফিরে এল নিজের ঘরে। জিনিসপত্র সবই আছে। শুধু ওরা নেই। তারপর অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ বাদে টেবিলের চিঠির টুকরোর দিকে

চোখ পড়ল অমিয়র। পড়ল চিঠি। একবার পড়ল, দুবার পড়ল, তিনবার পড়ল। অর্থবোধ যেন আর হতে চায় না। তারপর একটা দুঃসহ যন্ত্রণাবোধে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হোল অমিয়র।

কিন্তু এও কি সম্ভব? এও কি সম্ভব?

নির্মল দত্ত সবচেয়ে আগে খবর পেল। অমিয় তাকেও জিজ্ঞেস করল, 'কি ক'রে এটা সম্ভব হোল অমিয়, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে।'

নির্মল ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি পারছি।'

অমিয় স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুমি যা বলবে আমি তা জানি। কিন্তু সেইটাই কি সব? মানুষের রুচি নেই, প্রবৃত্তি নেই, পাত্রাপাত্রজ্ঞান নেই? শিক্ষা সংস্কার কিছুরই তা বাঁধন মানবে না?'

নির্মল বলল, 'না মানতেও পারে। এসব রোগ বড় নিষ্ঠুর অমিয়।'

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে অমিয় বন্ধুকে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর। সব সময়ে তোমার ডাক্তারী না করলেও চলবে। আসল রোগ ওর টি-বি নয়, আসল রোগ ওর প্রকৃতিগত অসংযম। আমি তো গোড়া থেকেই ওকে জানি। আমার চেয়ে তুমি তো ওকে বেশি চেন না।'

নির্মল এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইল। একটু বাদে বলল, 'যাক, যা হবার তা হয়েছে। এবার খোঁজ-খবর করতে হয়, এখনো সময় আছে। আমার তো মনে হয় বেশি দূর যায়নি, কলকাতার মধ্যেই আছে ওরা।'

অমিয় বলল, 'যেখানেই থাকুক, কোন খোঁজ-খবরের প্রয়োজন নেই।'

ব'লে নিজের কাজ নিয়ে বসল অমিয়। বই লেখার কাজ, প্রুফ দেখার কাজ, কাজের কি অভাব আছে সংসারে?

নির্মল খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে থেকে এক সময় উঠে গেল। ডিস্‌পেনসারিতে রোগীদের আসবার সময় হয়েছে। তাছাড়া এবার বোধ হয় অমিয়কে খানিকক্ষণ একা থাকতে দেওয়াই ভালো।

অমিয় একাই রইল দিন কয়েক। ঠিক একা নয়। অফিসের ভিড়ে গিয়ে কাজ করল। বন্ধুদের ভিড়ে গিয়ে তর্ক করল। তবু একা, তবু একা।

খবর পেয়ে নিতাইচরণ জানা এলেন একদিন দেখা করতে। গ্রাম-সম্পর্কে জ্যেঠামশাই হন অমিয়র। জমিজমা কিছু আছে। বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। অবশ্য বেশবাস দেখলে তা ধরবার জো নেই।

তিনি দোষারোপ করে বললেন, 'গোড়াতেই তো ভুল হয়েছিল অমিয়। একে তো লেখাপড়া জানা টাউন বন্দরের মেয়ে। তারপর আবার কুলীন বামুনের ঘর। ওদের ঘরে ঘরে কেলেঙ্কারি। আমি আর জানিনে? ও মেয়ে কি তোর ঘরে সত্যিই থাকবে বলে তুই ভেবেছিলি? দু'দিন বেড়াবার জন্যে এসেছিল, সখ মিটেছে, বেড়িয়ে টেড়িয়ে চলে গেছে। তোকে অত ক'রে বললুম আমার সম্বন্ধী গৌরদাসের মেয়েটিকে তুই নে। বেশ ডাগর ডোগর ছিল, লেখাপড়াও একটু একটু জানত। তাতো তুই শুনলিনে—'

অমিয় বাধা দিয়ে বলল, 'যাক জ্যেঠামশাই। ওসব কথা যেতে দিন।'

নিতাইচরণ বললেন, 'যেতে দেব ছাড়া কি। ওর জন্যে তুই ভাবিসনে অমিয়। পুরুষ মানুষের কাছে মেয়েমানুষ কি। মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা! মাটির ঢেলা বই কিছু নয়। জীবনে কত মেয়ে আসে, কত মেয়ে যায়, যথার্থ যে পুরুষ সে ফিরেও তাকায় না। ফিরেও তাকাতে নেই অমিয়।'

অমিয় বলল, 'আপনাকে একটু চা আনিয়ে দেই, জ্যেঠামশাই।'

নিতাইচরণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না বাপু, তোমার ওসব সহুরে ভদ্রতা রাখো। চা আমি খাইনে। একটা বিড়ি থাকে তো দাও।'

অমিয় ওঁকে বিড়ি আনিয়ে দিল।

বিড়ি শেষ করে নিতাইচরণ উঠে গেলেন। একটা কথা বলি বলি করেও বললেন না। গৌরদাসের মেজো মেয়ে সরস্বতীর কথা। সেও বেশ ডাগর-ডোগর হয়েছে। চৌদ্দ ছাড়িয়ে পনেরোয় পা দিয়েছে। কিন্তু আজ সে কথা থাক। আর একদিন বলা যাবে। বাবাজীর মনের অবস্থা ভালো নয়। লেখাপড়া জানা ছেলে। ধাক্কাটা সামলাতে দু'দিন সময় নেবে।

নিতাইচরণ চলে গেলে অমিয় ওঁর উপদেশটা মনে মনে আর একবার আবৃত্তি করল। ফিরে তাকাতে নেই, ফিরে তাকাতে যেয়ো না।

ফিরে তাকাবে না অমিয়। জয়ার জন্যে কিছুতেই নিজেকে আকুল হতে দেবে না। সে তো নিজে জেনে শুনে ইচ্ছা করেই গেছে। তার জন্যে ব্যাকুল হলে নিজের পৌরুষকে অপমান করবে অমিয়, নিজেকে অসম্মান করবে।

মাইনে পেয়ে নতুন জুতো, নতুন জামা কিনল অমিয়। বহুদিন নিজেকে কষ্ট দিয়েছে। আর না। আর কিসের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন? এবার কিছুদিন ভালো খাবে, ভালো পরবে অমিয়। এখন থেকে সে দায়মুক্ত।

সুব্রত যতীনদের বলল, 'আমি মুক্তি পেয়েছি সুব্রত। বেঁচেছি। আর কোন বন্ধন নেই আমার। এবার থেকে আরো কাজ দাও আমাকে। আরো কাজ চাপাও আমার ঘাড়ে। আমি সব করব।'

সুব্রত বলল, 'বেশ তো কোরো।'

যতীন ওকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে বলল, 'আমার কাপড়টা তো

বেশ ভালো মনে হচ্ছে হে। কত করে নিল গঙ্গ? ...বর বাহুল্য নেই।

অমিয় বলল, 'আড়াই টাকা।' ... নিচু

তারপর নিজের জামার দিকে তাকাল। ছি ছি ছি! এ জামা তো মানায় না। এত দামী জামায় তো মোটেই মানায়নি তাকে।

পরদিন ফের পরে বেরোল সেই ছেঁড়া জামা আর তালি দেওয়া জুতো। এই ভালো তার এই ভালো। কিন্তু লোকে যে ভাববে এই দীন বৈরাগ্যের বেশ সেই অকৃতজ্ঞা স্ত্রীর জন্যে। লোকে যে মনে মনে হাসবে, মনে মনে অনুকম্পা করবে তাকে। না না, কারো অনুকম্পার পাত্র হতে পারবে না অমিয়। সে জয়াকে শাস্তি দেবে, শাস্তি দেবে।

নির্মল দত্তকে ডেকে বলল, 'যেমন করে পারো ওদের খুঁজে বার করো। পুলিশ লাগাও, ডিটেকটিভ লাগাও। ওদের শাস্তি না দিয়ে আমি সুস্থ মনে কাজ করতে পারছি নে নির্মল, আমি কিছুতেই সুস্থ থাকতে পারছি নে।'

নির্মল বলল, 'তুমি শান্ত হও অমিয়, আমি খোঁজখবর চালাচ্ছি। ধরা ওরা পড়বেই।'

নির্মল বন্ধুকে জোর ক'রে ধরে নিজের বাসায় নিয়ে গেল। ডিসপেনসারীর কাছে বাসা পায়নি। বাসা শশিভূষণ দে স্ট্রীটে আর সুকিয়া স্ট্রীটে ডিসপেনসারী। দুটিকে কাছাকাছি আনবার চেষ্টা করেছিল নির্মল, পারেনি। অমিয় সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'অমন কাজও কোরোনা, কর্মস্থল আর বাসস্থল আলাদা থাকাই ভালো।'

দোতলায় দুখানা ঘরের একটি ফ্লাট ভাড়া নিয়েছে নির্মল। ঘরগুলি মন্দ নয়। দক্ষিণ দিকটা খোলা আছে। ভিতরে আলো হাওয়া বেশ আসে। এর আগেও কয়েকবার এ বাড়ীতে এসেছে অমিয়। কিন্তু তখনকার আসার সঙ্গে এখনকার আসার যেন অনেক তফাৎ। নিজের এই দুর্ভাগ্য নিয়ে, মনের এই অস্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে কোন সুস্থ সুখী

নিতাইচরণ বাস্তু ক'তে যেন ভয় হয় অমিয়র, কিসের একটা অস্বস্তি আর সঙ্কোচ আসে মনে। অন্য সহকর্মী বন্ধুরাও অমিয়কে বাসায় ডেকেছে। কিন্তু সে নানা ওজর আপত্তি দেখিয়ে যায়নি। গিয়ে কি হবে। সেই আনুষ্ঠানিক সহানুভূতি জানানোর পালা। জয়া যদি মরে যেত বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষে সান্ত্বনা সহানুভূতি জানানো সহজ হোত। কিন্তু ব্যাপারটাকে বড় বিদঘুটে ক'রে দিয়ে গেছে জয়া। স্ত্রী-পরিত্যক্ত অমিয়কে সান্ত্বনার নয়, সকলের কাছে কৌতুকের পাত্র করে রেখে গেছে জয়া। তাই যতদূর পারে পরিচিত সকলের সঙ্গ অমিয় এড়িয়ে চলে। জয়ার প্রসঙ্গ উঠলেই তাকে অন্য কথা এনে চাপা দেয়।

কিন্তু নির্মল নাছোড়বান্দা। তার হাত কিছুতে এড়াতে পারল না অমিয়। বন্ধুকে স্ত্রীর সামনে হাজির ক'রে দিয়ে নির্মল বলল, 'দেখ তো নীলি। আমি ভেবে পাইনে এতে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে থাকবার কি হয়েছে অমিয়র। ও কারো বাড়িতে যাবে না, কারো সঙ্গে মিশবে না। যেন দুষ্কার্যটা ওই করেছে।'

নীলিমা স্বামীর মত অত সপ্রতিভ নয়। বরং লাজুক ধরনের মেয়ে। বাইশ তেইশ বছর হবে বয়স। ছোট-খাট চেহারা। গায়ের রঙ শ্যামলা। নাকটি ছোট, চোখ দুটিও। তবে মুখখানা ভারি নিরীহ আর কোমল। সহজ লাবণ্যে স্নিগ্ধ। একেবারে মেয়েলি মেয়ে। এতদিন নির্মলের স্ত্রীর দিকে অমিয় লক্ষ্যও করেনি। মনোযোগের অযোগ্য বলে মনে করেছে। কিন্তু আজ নীলিমাকে অমিয়র ভারি ভালো লাগল। আকৃতি প্রকৃতিতে জয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই বোধ হয় বন্ধুর স্ত্রীর ওপর আজ অমিয়র এই পক্ষপাতিত্ব।

স্বামীর কথার জের টানল না নীলিমা। প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে অমিয়কে স্নিগ্ধস্বরে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন। ঈস কি চেহারাই করেছেন। ভালো ক'রে নাওয়া খাওয়াও হয়না বোধহয়।'

বসবার ঘরখানা সুন্দর ক'রে সাজানো। আসবাবের বাহুল্য নেই। কিন্তু পরিচ্ছন্ন রুচি আর পারিপাট্যের ছাপ আছে। দু'তিনখানা নিচু চেয়ার। মাঝখানে সাদা ঢাকনিতে ঢাকা একটি গোল টেবিল। পুব-দক্ষিণ কোণে ছোট একটি বইয়ের শেলফ। ওপরে দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একখানি ফটো। উল্টো দিকে পাশাপাশি লেনিন আর ষ্ট্যালিন।

নীলিমার কথার জবাবে অমিয় মৃদু একটু হাসল, বলল, 'না, যা ভাবছেন তা নয়, নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিইনি।'

সামনের চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে নীলিমা এবার বসে পড়ল, লজ্জায় একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর সংকোচ কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'কেন, নাওয়া খাওয়া ছাড়বেন কোন দুঃখে। আপনার দুঃখ কিসের। দুঃখ তো আমাদের।'

অমিয়র মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটল, বলল, 'আপনাদের দুঃখ? কেন বলুন তো।'

নীলিমা বলল, 'আমাদেরই তো দুঃখ অমিয়বাবু। সে যা ক'রে গেছে তাতে আমাদের—মেয়েদের লজ্জাই যে সব চেয়ে বেশি।' বলে নিচের দিকে তাকিয়ে নীলিমা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর একসময় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বসুন, 'আমি এক্ষুণি আসছি।'

ঠিক পরমুহূর্তেই অবশ্য ফিরে এল না নীলিমা। অমিয় বুঝতে পারল ও খাবার-টাবার করতে গেছে। এ বাড়ীতে এসে কিছু না খাইয়ে নীলিমা তাকে ছাড়ে না। অমিয় নির্মলকে বলল, 'তোমার স্ত্রীকে নিবেধ করো, চা-টা যেন কিছু না করে। আমি এক্ষুনি উঠব।'

নির্মল ওর কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, 'বোসো বোসো, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন অমিয়, তোমার কাছে এসব আশা করিনি।'

অমিয় অদ্ভুত একটু হাসল, 'কি সব ? তোমার স্ত্রীর হাতের চা না খেয়ে চলে যাওয়া ? আচ্ছা, তাহলে সুস্থ হয়েই বসছি।'

নির্মল বন্ধুর দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ বোসো। আমি বাথরুম থেকে চান-টান সেরে আসছি, এক সঙ্গে বেরোব। বোসো, পালিওনা যেন।'

অমিয় বলল, 'না হে অতটা বিরহ-বিকার এখনো আসেনি। তুমি নিশ্চিন্তে চান করতে যাও।'

নির্মল চলে গেল। কিন্তু বন্ধুর নয় বন্ধুর স্ত্রীর কথাটাই অমিয়র বার বার কানে বাজতে লাগল, 'এ লজ্জা আমাদেরই।' এই কদিন ধরে কত সান্ত্বনা, কত আশ্বাসের বাণীই তো কতজনের কাছ থেকে শুনেছে অমিয়। কিন্তু এই একটি কথার সঙ্গে যেন কিছুরই তুলনা হয় না। এই ছোট একটি কথার মধ্যে অনেকখানি মমতা, অনেকখানি মাধুর্য ভরে দিয়েছে নীলিমা, যা আর কোথাও মেলেনি। আশ্চর্য, এই কদিন ধ'রে কোন মেয়ের মুখোমুখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অমিয়। যেন সকলের মুখেই আছে জয়ার মুখ। যেন গোটা মেয়ে জাতই অবিশ্বাসিনী, ছলনাময়ী। কিন্তু নীলিমাকে দেখে নীলিমার কথা শুনে ভুল ভেঙেছে অমিয়র, ফের ও প্রকৃতিস্থ হতে পেরেছে। একজনের দোষ হাজার জনের ঘাড়ে চাপাতে যাচ্ছিল অমিয়। নীলিমা তাকে সেই মূঢ়তা থেকে বাঁচিয়েছে। পতন থেকে রক্ষা করেছে।

'তুমি বুঝি বাবার বন্ধু ?'

বছর চারেকের একটি ছেলে দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর ফুটফুটে চেহারা। গায়ের রঙ নির্মলের মতই ফর্সা। মুখের আদলটা নীলিমার মত লম্বাটে।

হাতের ইসারায় অমিয় তাকে কাছে ডেকে বলল, 'এখানে এসো, বলছি।'

ডাকামাত্র ছেলেটি অসংকোচে অমিয়র কোলের কাছে এসে দাঁড়াল, 'এই তো এসেছি, এবার বলো।'

সাধারণত ছেলেপুলে পছন্দ করে না অমিয়, আদর করতে পারে না, আলাপ জমাতে পারে না তাদের সঙ্গে। কিন্তু আজ নির্মলের ছেলেকে সাগ্রহে একেবারে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তোমার বাবার আমি বন্ধু! তোমার নিজের কাকাবাবু। কি জ্যাঠামণিও বলতে পারো। তোমার বাবার চেয়ে বয়সে কিছু বড়ই হব।'

ছেলেটি ফিক্ করে হেসে ফেলল, 'দূর, জ্যাঠামণি বলে না কি। জ্যাঠামণি ভালোনা, কাকাবাবু ভালো। মা বলে দিয়েছে কাকাবাবু।'

অমিয় বলল, 'তাহলে তো আর কথাই নেই। মা যা বলে দিয়েছেন তাই বলবে। তোমাকে কি বলব খোকা, তোমার নাম কি?'

'আমার নাম টুলুবাবু, আমার বোনের নাম বুলুরাণী। ও ঘরে দোলনায় ঘুমুচ্ছে, চল দেখবে।'

টুলু অমিয়র হাত ধরে টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল অমিয়র। অল্প বয়সে দোলনায় তাকেও শুইয়ে রাখত জয়া। মাঝে মাঝে অমিয় সেই ঘুমন্ত শিশুর কাছে এসে দাঁড়াত। কোনদিন বা আলগোছে আঙুল ছোঁয়াত গালে।

কোন কোন দিন জয়ার কাছে ধরা পড়ে যেত। জয়া হেসে বলত, 'ওকি হচ্ছে। আমার সামনে কি উদাসীন আর কি নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর ভঙ্গি। আর এদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে আদর করা হচ্ছে মেয়েকে। কিন্তু দোহাই তোমার, আদরের চোটে এই অসময়ে ওকে জাগিয়ে দিয়ো না যেন, তাহলে আমার কাজকর্ম সব পণ্ড হবে।'

কিন্তু জয়ার স্মৃতি আর তার কথার স্বর, তার হাসির ভঙ্গি একেবারে ভুলে যাবে অমিয়। স্মরণীয়া নয়, বিস্মরণীয়া।

অমিয়র মনে পড়ল জয়ার মৃত্যু যাওয়ার খবর পেয়ে শ্যালক

বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন শাশুড়ী এসেছিলেন তার বাসায়। কৈফিয়ৎ তলবের স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমার মেয়ে কোথায় ?'

অমিয় বলেছিল, 'কোথায় তাতো শুনেছেনই। মনোতোষের সঙ্গে সে চলে গেছে।'

বীরেন চটে উঠে বলেছিল, 'ছি ছি। স্বামী হয়ে স্ত্রীর নামে তুমি এই সব বাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছ ?'

অমিয় একটু হেসে বলেছিল, 'আমি কিছুই রটাচ্ছিনে। যা ঘটেছে তাই শুধু বললাম। বিশ্বাস করা না করাটা আপনাদের মর্জি।'

নিভাননী বললেন, 'কেন গেল ? তুমি নিশ্চয়ই তার ওপর মারধোর অত্যাচার চালিয়েছ। নইলে সে তো এমন অবুঝ মেয়ে নয়, দজ্জাল বদমাস নয়। নিশ্চয়ই তোমার জ্বালায় ঘরে থাকতে না পেরে সে চলে গেছে।'

অমিয় নির্বিকারভাবে বলেছিল, 'বললুম তো আপনাদের যা খুসি বিশ্বাস করতে পারেন। আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।'

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'এবার মঞ্জুকে আপনি ফিরিয়ে দিতে পারেন।'

নিভাননী মুখ বিকৃত ক'রে গলা চড়িয়ে বলেছিলেন, 'তোমার মেয়েকে ? কক্ষনো না, কক্ষনো না। আগে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও তারপর নিজের মেয়ের কথা ভেব।'

রাস্তায় নেমে আবার কি ভেবে নিজেই ফিরে এসেছিলেন নিভাননী। এবার আর ছেলের সঙ্গে নয়, একা। জামাইয়ের কাছে এসে গলা নামিয়ে বলেছিলেন, 'ও সব কথা রটিও না, তাতে তোমারও কলঙ্ক আমারও কলঙ্ক। বাইরে বলো, সে পুলিসের ভয়ে, জেল ফাঁ[illegible] ভয়ে পালিয়ে আছে। তোমাদের মধ্যে তো এসব কাণ্ড হয়। না এ[illegible]না, বলো যে মরে গেছে। হতভাগী মরলেও যে বাঁচতাম।'

তারপর গলা ধরে এসেছিল নিভাননীর, ছলছল করছিল চোখ। কি ভেবে চলে যাওয়ার আগে তিনি হঠাৎ এগিয়ে এসে কাঁধে হাত রেখেছিলেন অমিয়র। সেই প্রথম তিনি স্পর্শ করেছিলেন জামাইকে। এর আগে আশীর্বাদের জন্যেও তিনি কোন দিন অমিয়কে ছোঁননি কিংবা ওকে তাঁর পা ছুঁতে দেননি।

কাঁধে হাত রেখে তিনি বলেছিলেন, 'শোন, মঞ্জুর জন্যে ভেবনা, আমিতো আছি। তুমি সেই হতভাগীর খোঁজ করো।'

অমিয় নীরবে ঘাড় নেড়েছিল।

'কই চল, আমার বোনকে দেখবে চল।'

টুলু আর একবার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল অমিয়র। চা আর খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল নীলিমা। ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল, 'ওকি হচ্ছে টুলু, ওকি দুষ্টুমি হচ্ছে শুনি?'

সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটি ফুলে উঠল টুলুর। ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল অমিয় তাকে জোর করে আঁকড়ে ধরল, 'না না টুলু খুব ভালো ছেলে, ও মোটেই দুষ্টুমি করেনি। আপনি কেন মিছামিছি বকছেন ওকে। বোনকে দেখাবার জন্যে টুলু আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছিল আপনি এসে বাধা দিলেন।'

নীলিমা একটু লজ্জিত হোল। ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহা বোন যেন আর কারো হয় না। অমনিতে হিংসেয় ফেটে মরে, কিন্তু বাড়ীতে যদি কেউ এলেন তাঁকে না দেখানো পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। যেন কি এক অমূল্য রত্নই ও পেয়েছে।'

অমিয় একটু হাসল, 'অমূল্য রত্ন কি কেবল টুলুই পেয়েছে?'

নীলিমা একথার কোন জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে খাবারের প্লেটটা অমিয়র দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আপনি খান। ওর জন্যে অপেক্ষা করবেন না। উনি এসময় লুচি তরকারি কিছু খান না।

রোগী দেখে এসে ভাত খেতে খেতেই বেলা ছুটো আড়াইটে হয়।'

একটু বাদে বলল, 'মেয়ের কি ব্যবস্থা করলেন? সে বুঝি তার দিদিমার কাছেই আছে?'

অমিয় বলল, 'হ্যাঁ।'

নীলিমা আস্তে আস্তে বলল, 'আশ্চর্য, কি ক'রে সে পারল। একবার নিজের মেয়ের মুখ তার মনে পড়ল না, তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখল না। এখন নিশ্চয়ই ভাবছে, যেখানেই থাকুক এখন নিশ্চয়ই জ্বলে পুড়ে মরছে।'

অমিয় বলল, 'আমার তো মনে হয় সে সুখেই আছে। আপনি অনর্থক তার জন্তে ছুশ্চিন্তা করছেন।'

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে নির্মল ঘরে ঢুকল, 'কি পরামর্শ হচ্ছে ছুজনের? দূর থেকে দেখে বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠল।'

পরিহাসটা বুঝতে পেরে লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল নীলিমা, তারপর রাগ ক'রে স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার মুখের যদি কোন আগল থাকে! সব কিছু নিয়েই ঠাট্টা, না?'

নির্মল হাসতে হাসতে বলল, 'না, শুধু ঠাট্টা তামাসা ভেবে আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি কই। জয়া বড় ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে মনে। তোমাদের কাউকে দিয়ে আর বিশ্বাস নেই।'

নীলিমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'চুপ করো, ও সব বাজে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না। কেবল জয়ার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ, মনোতোষও তো তোমাদেরই জাত।'

তারপর অমিয়র দিকে ফিরে এবার অপেক্ষাকৃত উচ্চ উত্তেজিত স্বরে বলল, 'আপনি সহজে ছাড়বেন না অমিয় বাবু। যেভাবে পারুন সেই লোকটাকে খুঁজে বার করুন, তাকে উচিত শিক্ষা দিন।'

তারপর নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল নীলিমা।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বলল, 'আপনাকে লুচি দিই আর দু'খানা।'

অমিয় আপত্তি ক'রে বলল, 'না না।'

নীলিমা বলল, 'না না কেন। আপনি তো কিছুই খেলেন না।'

চায়ের পর্ব শেষ হওয়ার পর নির্মল আর অমিয় একসঙ্গেই বেরোল। তাদের সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিল নীলিমা, তারপর অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি তো আজকাল আর আসেনই না। আসবেন মাঝে মাঝে।'

অমিয় মৃদু হেসে মাথা নাড়ল। আজকাল কোথাও কার বাড়ীতেই সে আর যায় না। জয়া চলে যাওয়ার পর থেকে সর্বাণীদের বাড়ীতে যাতায়াত প্রায় বন্ধ করল অমিয়। অদ্ভুত এক সংকোচ ওকে পেয়ে বসেছে। জয়ার অসামাজিক অবৈধ আচরণ যেন অমিয়কেও একঘরে ক'রে রেখে গেছে। কোন পারিবারিক পরিবেশ আর ভালো লাগে না। বিশেষ করে সর্বাণীদের বাড়ী। সর্বাণীর মা আর দাদার আচার ব্যবহারেরও আজকাল যেন বেশ একটু পরিবর্তন ঘটেছে। অমিয়কে দেখলে তাঁরা গম্ভীর হয়ে যায়। তার সান্নিধ্যে বিরক্ত বোধ করে। সর্বাণীরও তেমন দেখা মেলে না। মহিলা সমিতির কাজ নিয়ে সে নাকি খুব ব্যস্ত।

মনে মনে হাসল অমিয়। ব্যাপারটা সে আন্দাজ করেছে। শুধু আন্দাজ কেন, নানা মুখ থেকে ঘুরে ঘুরে জনরবটা তার কানেও এসে পৌঁছেছে। অমিয়র সঙ্গে সর্বাণীর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আপত্তিকর ইঙ্গিত। জয়ার গৃহত্যাগের জন্যে অমিয়ই দায়ী কোন্ অন্তঃপুর থেকে এ কথাটা যে প্রথম চালু হয় তা আর এখন বের করবার জো নেই। কিন্তু মুখে মুখে গল্পটা বেশ জমে উঠেছে। দলের একটি কুমারী মেয়ের ওপর অমিয়র অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকায় ইদানীং স্ত্রীর সে খোঁজ খবর নিত না। স্ত্রী আপত্তি করলে তার ওপর গালাগালি চড় চাপড় পর্যন্ত বর্ষণ চলত। তাই অতিষ্ঠ হয়ে জয়া মনোতোষের সঙ্গে পালিয়েছে।

নইলে মনোতোষের মত অকাট মূর্খ কি তার মনের মানুষ হ'তে পারে?

সর্বাণীর মা একদিন ইতস্তত করে বললেন, 'বাজে লোকের বাজে রটনায় অবশ্য কিছু এসে যায় না। তবু যতদূর সম্ভব আমাদের সাবধান হওয়াই ভালো অমিয়।'

অমিয় একটু হাসল, 'নতুন করে সাবধান হওয়ার কিছু নেই, আপনি সেজন্যে চিন্তা করবেন না।'

এরপর যুগবাণী অফিসেই সর্বাণীর সঙ্গে একদিন দেখা হোলো। মহিলা সমিতির এক সভার বিবরণ দিতে এসেছে। অমিয়কে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'আপনি নাকি খুব মুষড়ে পড়েছেন?'

অমিয় বলল, 'তোমার কি তাই মনে হচ্ছে?'

সর্বাণী বলল, 'তাই তো শুনতে পাচ্ছি। আমাদের বাড়ীতে আজকাল তো ভুলেও যান না।'

অমিয় বলল, 'নানা কাজে ব্যস্ত থাকি। তাছাড়া কি সব গুজব ছড়াচ্ছে শুনেছ তো!'

সর্বাণী একটু আরক্ত হয়ে উঠল। খানিক বাদে বলল, 'শুনেছি, কিন্তু ওসব আমি গ্রাহ্য করিনে।'

অমিয় বলল, 'আমি করি। দলের সুনাম ওতে ক্ষুণ্ণ হয়। জয়া একাই যথেষ্ট ক্ষতি করে গেছে।'

সর্বাণী স্থির দৃষ্টিতে অমিয়র দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে মৃদু হাসল, 'আপনি ভুল করছেন অমিয়দা। দলের সুনাম আপনার কাছে যেমন দামী, আমার কাছে তেমনি। শুধু সেই সুনাম রক্ষা করবার ধরণটা আলাদা। ওরা অভিযোগ করছিলেন আপনি আজকাল আর তেমন মন দিয়ে কাজকর্ম করছেন না। কতকগুলি বুকলেট আপনাকে তৈরী করতে দেওয়া হয়েছে। যথেষ্ট তাগিদ সত্ত্বেও একখানা ম্যানাস্ক্রিপ্টও আপনি আজ পর্যন্ত দিয়ে উঠতে পারেন নি।'

অমিয় বলল, 'সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দেব না সর্বাণী।'

সর্বাণী বলল, 'যার কাছেই দিন কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে হবে—সেইটাই বড় কথা, সেইটাই দুঃখের কথা। জয়া বউদি শুধু নিজেই মরেনি, আপনাকেও মেরে রেখে গেছে।'

অমিয় বলল, 'তুমি তোমার অধিকারের বাইরে চলে যাচ্ছ সর্বাণী। এবার নিজের কজে মন দাও।'

সর্বাণী আর কিছু বলল না। মনে হোল এক ঝিলিক ব্যঙ্গের হাসি ওর ঠোঁটের কোণে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। পরমুহূর্তে অমিয়র সামনে থেকে দ্রুতপায়ে সরে গেল সর্বাণী।

দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে লাগল অমিয়। জয়া তার কর্মশক্তি নষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে এ অপবাদ সে সহ্য করবে না। এ দুর্নামের যে কোন ভিত্তি নেই তা সে প্রমাণ করবে।

তার কাজ সভা-সমিতি, মিছিল শোভাযাত্রায় নয়, তার কাজ হাতে-কলমে নয়, কাগজে-কলমে। নিজের কর্মক্ষেত্র এবার নির্দিষ্টভাবে বেছে নিল অমিয়। আর সেই ক্ষেত্রে নিজেকে একান্তভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখল। ফিরিয়ে দিল বুকলেট রচনার ভার, সংক্ষিপ্ত সহজবোধ্য এক-পেশে ইতিহাস রচনার দায়িত্ব। ইতিহাস যদি সে লেখেই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখবে। তার জন্যে আগে চাই তৈরী হওয়া, চাই পরিমিত প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির কাজে লেগে গেল অমিয়। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, কোথায় কোন মালমশলা আছে, পুঁথিপত্র ঘেটে তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হোলো অমিয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কাটে গ্রন্থশালায়। কাজে হাত দেওয়ার আগে কাজের অধিকার অর্জন করা চাই।

দলের মুরুব্বিস্থানীয়দের কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হলেন। ব্যক্তিগত ক্ষতিকে যে অমিয় এমন বড় করে দেখবে, পড়াশুনোর নাম করে এমন ভাবে

আত্মগোপন করবে, তা যেন তাঁরা আশঙ্কা করেননি। যে অমিয়কে তাঁরা জানতেন সে ছিল আলাদা মানুষ।

ক'বছর আগেও সওদাগরী অফিসে দরিদ্র সহকর্মীদের ভাতা আর বেতন বৃদ্ধির দাবীতে শক্তিমান মালিককুলের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধর্মঘট চালিয়েছে অমিয়। নেতৃত্ব করেছে কর্মীদের, ছেড়ে দিয়েছে তিনশো টাকা মাইনের চাকরি, হেরে গিয়েও ভেঙে পড়েনি। সামান্য কটি টাকার বিনিময়ে নিজের সমস্ত সময়, সমস্ত উদ্যম দলের দৈনিক পত্রের সেবায় নিয়োগ করেছে যে অমিয় তার একি পরিবর্তন, একি পরিণতি! এক রোগজীর্ণা বিকৃতমতি স্ত্রীর গৃহত্যাগের শোক কি তার কাছে এতই বড়? দলের চেয়ে দেশের চেয়ে আদর্শের চেয়ে বড়? মানুষকে চেনা ভারি শক্ত।

এ সব সমালোচনায় অমিয় হাসে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু নির্মলকে একদিন সে বলল, 'তোমাদের ধারণা ভুল, নির্মল। আমি নিষ্কর্মা হইনি, শুধু কাজের ক্ষেত্র বদলেছি। আমি অধিকার ভেদ মানি। সব কাজ সকলের জন্মে নয়।'

নির্মল বলল, 'সে কথা কে না মানে, কে না জানে? কিন্তু দলের কতকগুলি প্রাথমিক দাবী তোমার ওপর আছে, তা তুমি মেনে চলছ না, নালিশ সেইখানে।'

অমিয় বলল, 'প্রাথমিক দাবী মাধ্যমিক দাবী বলে যাও, বলে যাও। আমার ওপর তোমাদের দাবী আছে আর তোমাদের ওপর আমার কোন দাবী বুঝি নেই?'

প্রশ্নের ধরণ দেখে নির্মল হেসে বলল, 'আছে বই কি। তোমার হারানো স্ত্রীকে খুঁজে দিতে হবে। নইলে তোমাকেও আমরা হারাব, পাব না। ভেবনা, তারা ধরা পড়ল বলে।'

কিন্তু ধরা পড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যে চায়ের

কোম্পানীতে মনোতোষ কাজ করছিল সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সে চাকরি মনোতোষ ছেড়ে দিয়েছে। ওর পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের অমিয়রা চিনত তাদের কাছেও খোঁজ নেওয়া হোল। কিন্তু কেউ কোন খবর জানে না।

তারপর মাসখানেক বাদে নিজেই জয়া একদিন ধরা দিল। নিজেই একদিন বেরোল সেই বস্তির বিবর থেকে।

বস্তি। মজুর শ্রমিকদের বস্তি নয়, সর্বনিম্ন মধ্যবিত্তেরই বস্তি। বিত্ত বলতে শুধু নামটুকুই এখন আছে। কেউ বিড়ি বাঁধে, কেউ গামছা বিক্রি করে, কেউ খাটে কারখানায়। জমি বলতে আজ আর কারোরই কিছু নেই, কিন্তু জমির সংস্কারটুকু যাই যাই করেও যায়নি। এক এক গৃহস্থের এক একখানি গৃহ। মাটির দেয়াল, ওপরে টালী, মেঝেটা মাটির নয় সিমেন্টরই। তবে বেশির ভাগ ঘরেই তা গর্তবহুল। দু একটি জানলা আছে কারো কারো। সরু লম্বা বারান্দার চিলতে করে ভাগে পড়েছে। সেখানে রান্নার ব্যবস্থা। বৃষ্টি হলে ঘর দিয়েও জল পড়ে বারান্দা দিয়েও জল পড়ে। অনেক কষ্টের জ্বলন্ত উনান নিবু নিবু হয়। উঠন আছে একটুকু। এককোণে আছে খোলা কল আর চৌবাচ্চা। স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নেই। একই কলে যে যখন পারে স্নান সেরে নেয়। নিজের বারান্দায় বসে বসে অন্য ঘরের ঝি বউদের সেই মুক্ত-স্নান সংস্কারমুক্ত চোখে দেখে নানাবয়সী পুরুষ। কেউ বাধা দেয় না। বাধা দিয়ে লাভ নেই। এখানে এই যখন ব্যবস্থা চোখ তো আর মানুষে বন্ধ ক'রে রাখতে পারে না।

শুধু তাই নয়। জল-কল নিয়ে ঝগড়াটাও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে ঝগড়া শুরু হয় আস্তে আস্তে। তারপর গলা যত চড়ে, অশ্লীলতার মাত্রা তত বাড়তে থাকে।

এক এক ভাড়াটের ভাগে এক একখানা করে ঘর। কিন্তু এক এক

ঘরে লোক থাকে আট ন'জন। বাবা মা, স্বামী-স্ত্রী, বড় বড় ছেলেমেয়ে নিয়ে একই ঘরে পাশাপাশি বিছানায় থাকে। কিন্তু এক ঘরে থাকলেই যে এক হয়ে থাকে তা নয়, ঝগড়াঝাঁটি হাতাহাতি মারামারি লেগেই আছে।

সকালে বিকালে সারে সারে উনান জ্বলে। ধোঁয়ায় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার জো হয়, চোখে জল আসে।

ঘরে ঘরে যেমন ঝগড়া আছে, তেমনি আছে ব্যাধি। নানারকম ব্যাধি। তার সব নাম ডাক্তারী বইতে বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। রাজব্যাধিও আছে। যে ব্যাধি নিয়ে জয়া পালিয়ে এসেছে, সেই যক্ষার রোগীও এবাড়িতে আছে দু'তিন জন। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে বেছে বেছে খুব ভালো জায়গায়, খুব স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে এসেছে মনোতোষ। কিন্তু জয়া তো জানে, সে বাঁচবার জন্যে আসেনি। সে বাঁচবে না। কিছুতেই বাঁচবে না। দুঃসহ ক্ষয়রোগে তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদিন মরবে। জয়া মরবার জন্যেই এসেছে। এতগুলি লোক যেভাবে মরছে, সেও তেমনি ক'রে এদের সঙ্গে মিলে মিশে মরবে। তা মরেই যদি তাহ'লে আর ভয় কিসের। অপবাদের ভয়, লোকলজ্জার ভয়, সামাজিক রীতিনীতি আচার সংস্কৃতির ভয় কিছুই তাকে আর বাঁধতে পারবে না। কিন্তু মরবার আগে দু'দিনের জন্যে বাঁচবে। দেহের সব দাবী মিটিয়ে শুধু দেহময়ী হয়ে বাঁচবে।

'মনোতোষ এদিকে এসো, শোন।'

হাতের পোড়া বিড়িটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে মনোতোষ দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে জয়ার কাছে এসে বসল। আসবাবহীন ঘরের এককোণে ছোট একটি হারিকেন জ্বলছে।

মনোতোষ মুখোমুখি এসে বসল জয়ার, বলল, 'শোন বউ, তোমাকে

একটা কথা বলি। এখন আর যখন তখন তুমি আমাকে অমন ক'রে নাম ধরে ডেকোনা।

জয়া একটু হাসল, 'তবে কি বলে ডাকব? ওগো হ্যাঁগো? না কি আরও গালভরা নাম, প্রাণেশ্বর, হৃদয়েশ্বর? বল কোনটা তোমার পছন্দ।'

মনোতোষ বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ। কিন্তু ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। কেউ যেন কিছু বুঝতে না পারে। তুমি যে অত লেখাপড়া জানো তাও কাউকে জানতে দিয়ে দরকার নেই। খবরদার, খবরদার।'

জয়া বলল, 'কেন?'

মনোতোষ বলল, 'কেন আবার। দেখছ তো এখানকার হালচাল! বয়সে, বিদ্যেয়, বুদ্ধিতে তোমাকে আমার চেয়ে ছোট সেজে থাকতে হবে। লেখাপড়ায় আমি তো ঢু ঢু। সবাইকে দেখাবে তুমি আমার চেয়েও কম শিখেছ।'

জয়া হঠাৎ বলে ফেলল, 'তার চেয়ে তুমিই খানিকটা আরো বেশি শিখে নাও না কেন।'

মনোতোষ লজ্জিত হয়ে হেসে বলল, 'কার কাছে শিখব? তোমার কাছে? ব্যাপারটা কি রকম হবে।'

জয়া বলল, 'বেশ হবে। আমার কাছে প্রেমের পড়াও পড়বে স্কুলের পড়াও পড়বে। বই পত্র কিনে আন।'

মনোতোষ বলল, 'দূর, তাই কি আর হয়, কাল গেলে কি আর মাংটামো সাজে।'

জয়া বলল, 'কেন সাজবে না। খুব সাজবে। আজ থেকেই শুরু হোক। আনো, খাতা পেনসিল নিয়ে এস।' জয়া যেন বেশ খানিকটা কৌতুক বোধ করল। এও এক রকমের মজা। ভুলে থাকবার এও

এক রকমের উপায়। নিজেই উঠে পড়ল জয়া। ঘরে খাতা পেনসিল পাওয়া গেল না। মনোতোষের স্যুটকেশের ভিতর থেকে বেরুল সাদা এক টুকরা চকখড়ি। ফিতেটা বাড়িযে হ্যারিকেনটা এক হাতে ঝুলিযে আর এক হাতে সেই পেনসিলটুকু নিযে জয়া এসে সামনে বসল মনোতোষের, বলল, 'লেখ।'

মনোতোষ বলল, 'কি লিখব, কোথায় লিখব।'

'এই মেঝেতেই লেখ। লেখ প্রেমের অ আ ক খ।'

জয়া হেসে উঠল, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'লেখ, তোমার নাম লেখ। দেখি হাতের লেখাটি কেমন।'

বেদনার ছায়া পড়ল মনোতোষের মুখে। তার হাতের লেখা ভালো নয়। যেটুকু বিদ্যা, লেখায় তার চেয়ে আরো কম দেখায়।

তবু লিখল মনোতোষ। ধীরে ধীরে লিখল নিজের নাম। মনোতোষ মান্না। তারপর আর বলে দিতে হোল না, লিখল জয়া মান্না। কিন্তু বড় ছোট দেখায়। খাট খাট লাগে কানে। মুছে ফেলে ফের লিখল জয়াবতী মান্না। হ্যাঁ, এবার হয়েছে। অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে এবার।

নিজের এই গোত্রান্তর রূপান্তর দেখে মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল জয়ার, বলল, 'ও কি করছ!'

মনোতোষ তাকাল ওর মুখের দিকে, বলল, 'যা সত্যি তাই করছি। এখন আমিও মান্না, তুমিও মান্না। আমরা এক। আমরা স্বামী-স্ত্রী।'

স্বামী-স্ত্রী! ভিতরটা আর একবার শিউরে উঠল জয়ার। কিন্তু কোন কথা না বলে চুপ ক'রে রইল। আর ফেরার উপায় নেই। মনোতোষ পুরোহিত ডাকেনি, কোর্টে যায় নি। শুধু মেঝের ওপর এক সঙ্গে দু'জনের নাম লিখেছে। এই লেখাই চূড়ান্ত লেখা। এ লেখা কিছুতেই মুছবে না, মুছবে না।

কিন্তু একটু একটু ক'রে কি যেন ভাবতে ভাবতে মনোতোষ নিজেই মুছে ফেলল জয়ার নাম। শুধু মান্নাটুকু রাখল। বলল, 'পদবী পাল্টালাম, এবার তোমার নামটাও বদলে রাখি। তুমি আমার নতুন বউ।'

জয়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল। প্রেমের পাঠ শেখাতে বসেছিল ওকে, এখন কে কাকে শেখায়।

মনোতোষ আবার বলল, 'তোমার নতুন নাম রাখব।'

জয়া বলল, 'বেশ তো রাখো।'

মনোতোষ বলল, 'জয়াবতীর মত আর কি নাম আছে বল। এত মিষ্টি, এত মধুর।

মনোতোষ এগিয়ে এসে জয়াকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল, ঠোঁটের ওপর চুম্বন করল কয়েকবার। জয়া বাধা দিল না, আস্তে আস্তে বলল, 'রেখ। কিন্তু নামটাই রাখবে। আমাকে আর ক'দিন রাখতে পারবে মনোতোষ। আমি তো মরে যাব। দু'দিন কি বড় জোর দু'মাস বাদেই তো আমি মরে যাব।'

'মরবে? কেন মরবে? এই সুখের সংসার এই সোনার পৃথিবী ছেড়ে কেন মরবে তুমি? কোন্ দুঃখে মরতে চাইছ?'

জয়া বলল, 'মরতে চাইনে মনোতোষ। কিন্তু মরতে না চাইলেও মরতে হয়। এই নিয়ম সংসারের। আমার অসুখের কথা কি তুমি জানো না?'

পিঠে যেন বেত পড়ল মনোতোষের, কাতর আর্তনাদের স্বরে বলল, 'জানি।'

একটু বাদে অত্যন্ত আফসোসের সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলল, 'জেনেও এতদিন কি রকম ভুলে আছি দেখ। নতুন কাজ জোটাতে হোল, রেশন কার্ড বদলাতে হোল, এত ঝামেলায় তোমার সেই

রোগের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি কেন এক ফাঁকে মনে করিয়ে দিলে না বউ, দেখি গোটাটা কত বড হয়েছে দেখি।'

বলে পরম স্নেহে জয়ার পায়ের সেই abcessটার ওপর হাত বুলাতে লাগল মনোতোষ। যেন তাতেই সব সারবে, সব রোগের সব কষ্টের শান্তি হবে।

তারপর একটু বাদে বলল, 'কালই চল ডাক্তারের কাছে। সহবে এ-রোগের সব চেয়ে বড ডাক্তার, সব চেয়ে বেশি ভিজিটের ডাক্তারেব কাছে যেতে হবে।'

এমন আকুলতা একদিন আরো একজন দেখিয়েছিল। তার কথা মনে পডল জয়ার।

আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছেডে বলল, 'থাক, ডাক্তারের আর কাজ নেই। ডাক্তার দেখিয়ে কি হবে!'

মনোতোষ রুক্ষস্বরে বলল, 'কি হয় না হয় সে কথা পবের। আগে তো ডাক্তার দেখাই, তুমি ব'সো আমি ঘুরে আসছি।'

বলে মনোতোষ উঠে পডল, খানিকক্ষণ ধরে নিজের স্যুটকেসটা হাতডাল, বেরুল ক্ষয়ে যাওয়া দুটো সোনার তাবিজ। মরা মায়ের শেষ চিহ্ন। একটু ইতস্তত করল মনোতোষ, তারপর তাবিজ দুটো তুলে নিয়ে ছিটের হাফ সার্টটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

জয়া বলল, 'না খেয়ে দেয়ে এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?'

মনোতোষ বলল, 'যাচ্ছি না, এলাম বলে।

অত তাড়াতাডি এল না, রাত বারটা সাড়ে বারটায় মনোতোষ ফিরে এল ঘরে, এসে বলল, 'ভিজিটের টাকা জোগাড করেছি বউ, আর কোন চিন্তা নেই।'

জয়া বলল, 'অত কষ্ট করতে গেলে কেন। কোন একটা হাস-পাতালের আউট ডোরে প্রথমে দেখালেই হোত।'

মনোতোষ বলল, 'বিনা পয়সার ডাক্তার? না, বিনা পয়সার ডাক্তারেরা ভালো ক'রে মন দিয়ে দেখে না, আমি টাকা দিয়ে দেখাব।'

মনোতোষ নাছোড়বান্দা। পরদিন অন্য সব কাজকর্ম ফেলে অফিস কামাই ক'রে রিকসায় ক'রে জয়াকে নিয়ে চলল বড় একজন টি বি স্পেশ্যালিস্টের বাড়িতে।

প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে বসে রইল দুজনে। সাজানো গুছানো সুন্দর ভিজিটার্স রুম। বড় একটা গোল টেবিল ঘিরে কুশন আঁটা দামী দামী চেয়ার। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। মনোতোষ বেশ আরাম ক'রে বসে বলল, 'আঃ!' আরো দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁরা অবাক হয়ে তাকালেন। মনোতোষ জয়ার দিকে চেয়ে দেখল, ওর মুখও আরক্ত হয়ে উঠেছে।

গোল টেবিলটার ওপর কতকগুলি বিদেশী ম্যাগাজিন ছড়ানো। অন্যমনস্ক হবার জন্যে তার একটা টেনে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগল জয়া।

তারপর একটু বাদেই ডাক পড়ল ডাক্তারের ভিতরের চেম্বারে। জয়ার বুক টিপ টিপ করতে লাগল। মুখ গেল পাংশু হয়ে। ডাক্তার কি বলবেন তার ঠিক কি।

মনোতোষ বলল, 'তোমার কোন ভয় নেই, চল আমিও যাচ্ছি।'

ডাক্তারের বয়স হলেও এখনো বেশ শক্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ। স্নিগ্ধ সৌজন্যে বললেন 'এসো মা দেখি কি হয়েছে। কোথায় কষ্ট তোমার।'

ডাক্তারের সহকারী এর আগে জয়ার রোগের আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখে নিয়ে গিয়েছিল। তাতে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন 'কই দেখি তোমার পা।'

চেয়ারের ওপর পা'টা তুলল জয়া। ওর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। হয়তো এক্ষুণি বলবেন, তোমার পা'টা ampute করতে হবে।

কিন্তু ডাক্তার গোটাটা আঙুল দিয়ে একটু টিপে দেখে একেবারে অন্য কথা বললেন, 'কে বলেছে এটা টি-বি-র abcess। ননসেন্স্। খুব অর্ডিনারি abcess এটা। কেন পুষে রেখেছ এতদিন। ছাড়িয়ে দিলেই হোত। আমার এ্যাসিস্ট্যান্টকে বলছি, এক্ষুণি ছাড়িয়ে দেবে। দেখবে তুমি টেরও পাবেনা।'

প্রথমে জয়ার মন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে অদ্ভুতভাবে বেঁচে গেছি।

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত মন ওর দুঃসহ অনুশোচনা, বেদনা আর নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ল। ছি ছি ছি। এর জন্যে এই সাধারণ একটা ফোঁড়ার জন্যে—।

জয়া বলে উঠল, 'ডাক্তারবাবু, আপনি ভালো করে দেখেছেন? আপনি বরং বলুন, ওটা খারাপ টিউমার। আপনি বরং বলুন, তুমি আর বাঁচবে না। আমি যে মরে গেছি ডাক্তারবাবু, আমি যে আগেই মরে গেছি।'

ডাক্তার হাসলেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? কেন, মরবে কেন, মরবার কি হয়েছে? কে তোমাকে কি বলেছে না বলেছে আর অমনি তুমি ভয় পেয়ে গেলে? দত্তকে বলে দিচ্ছি আমি। ও এক্ষুণি তোমার মনের সব সন্দেহ ঘুচিয়ে দেবে।'

খানিক বাদে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পা নিয়ে মনোতোষের সঙ্গে রিকসায় উঠল জয়া। ঘা'টায় একটু যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা হচ্ছে ওর মনে। কেন বাঁচলুম, কেন বাঁচলুম!

কিন্তু মনোতোষের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, উৎসাহে দীপ্ত। অনেকদিন বাদে ও পুরো এক প্যাকেট সিগারেট কিনেছে মোড়ের দোকান থেকে,

তার একটা বের ক'রে ধরিয়ে মনোতোষ বলল, 'আমি বলিনি, তোমার কিচ্ছু হয়নি ?'

রিকসা বেলেঘাটার দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ জয়া বলে উঠল, 'না ওদিকে নয়, ওদিকে নয়।'

মনোতোষ অবাক হয়ে বলল, 'তবে কোন্ দিকে। এদিকেই তো আমাদের বাসা।'

জয়া বলল, 'না ওদিকে নয়। ও বাসায় আর নয়। আমাকে ছেড়ে দাও মনোতোষ, ছেড়ে দাও।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল মনোতোষ। তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাল জয়ার মুখের দিকে। সিগারেটের ফুলকি ওর দুই চোখেও জ্বলছে।

মনোতোষ বলল, 'ও, মরবার জন্তে আমাকে সঙ্গে ডেকেছিলে, থাইসিসের বিষ আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্তে আমার সঙ্গে আসতে পেরেছিলে। আর এখন যখন শুনলে বেঁচে গেছ ভালো হয়ে গেছ তখন আর আমি তোমার কেউ নই। বামুন কায়েতের জাত তোমরা এমন নেমকহারামই বটে।'

জয়া স্তব্ধ হয়ে রইল।

মনোতোষ ফের বলল, 'বেশ চলে যাও। তোমার যেখানে খুশি চলে যাও। আমি তো তোমাকে জোর ক'রে ধরে রাখিনি। এই রিকসাওয়ালা, রোকো।'

রিকসাওয়ালা অবাক হয়ে রিকসা থামাতে যাচ্ছিল, জয়া বাধা দিয়ে বলল, 'না চালাও।'

কোথায় যাবে সে, তার যাওয়ার সব জায়গাই তো রুদ্ধ হয়ে গেছে। নিজের মৃত্যু সে নিজে ডেকে এনেছে। কঠিন রোগের হাত থেকে বাঁচলেও নিজের দেওয়া এই মৃত্যুদণ্ড তাকে মাথা পেতে নিতেই হবে।

রিকসা চলতে লাগল।

জয়া হঠাৎ এক সময় বলে উঠল, 'কিন্তু মনোতোষ, আমার যে একটি মেয়ে আছে। আমি যে তাকে আর পাব না।'

এতদিন যখন বাঁচবার আশা ছিল না তখন কারো কথাই আর মনে পড়েনি জয়ার, কাউকেই তার দরকার হয়নি। কিন্তু এখন যখন বেঁচে উঠেছে, তখন তার সবাইকেই চাই, কাউকে না হলে চলবে না।

মনোতোষ জয়ার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আদর ক'রে একটু চাপ দিয়ে কোমল স্বরে বলল, 'ও তুমি বুঝি সেই কথা ভাবছিলে। সেইজন্যেই ছট্‌ফট্‌ করেছিল। তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই। কে নেবে তোমার মেয়েকে, ঘাড়ে এমন কার কটা মাথা আছে। আমি আজই গোমরামুখী বুড়ীটার কাছ থেকে মেয়েকে কেড়ে আনব।'

এত দুঃখেও জয়ার হাসি পেল। বলল, 'সে বুড়ী আমার মা, তাকে গালমন্দ কোরো না মনোতোষ, তার কোন দোষ নেই। সে তো আর সত্যি সত্যি মেয়ের মালিক নয়। থাক, মার কাছে যতদিন থাকতে পারে থাক।'

আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর জয়া বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে, কিছু মনে কোরো না, তুমি কি সত্যি সত্যিই নির্মল ডাক্তারকে ওই সব কথা বলতে শুনেছিলে? আমার পায়ের খারাপ ফোঁড়ার কথা ও কি সত্যিই বলেছিল?'

মনোতোষ জয়ার দিকে তাকাল, বেদনার ছাপ পড়ল ওর মুখে, বলল, 'তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস করছ বউ? ভাবছ মিথ্যে বলে তোমাকে ভুলিয়ে এনেছি?'

জয়া বলল, 'না না, আমি ঠিক তা বলছিনে।'

মনোতোষ বলল, 'মোটেই তা নয়। মোটেই মিথ্যে বলিনি আমি। যা শুনেছি তাই বলেছি। দেখ, আমি অনেক খারাপ কাজ করেছি,

অনেক পাপ কাজ করেছি। অমন যে উপকারী মানুষ অমিয়দা তাকেও ঠকিয়েছি। কিন্তু তোমাকে ঠকাইনি। আর যাই করো, আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরো না, আমি তা সইতে পারব না বউ।' বলতে বলতে মনোতোষের চোখ দু'টি ছল ছল ক'রে উঠল।

জয়া আস্তে আস্তে ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল, 'তোমাকে অবিশ্বাস করব না।'

বাসায় এসে মনোতোষই প্রথমে কথাটা ছড়িয়ে দিলে। ঘরে ঘরে বলে বেড়াল, তার বউয়ের খারাপ অসুখ-টসুখ কিচ্ছু হয়নি। সাধারণ একটা ফোঁড়া হয়েছিল। সেটা বড় ডাক্তারকে দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। তার বউ এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

হরলাল কাকার বউ রামদুর্গা কোলের ছেলের মুখে স্তনের বোঁটা গুঁজে দিতে দিতে এসে বলল, 'তাইতো ভাবি, বউমা এমন রাত দিন ঘরে দোর দিয়ে থাকে কেন। কিসের দুঃখে। এই নিয়ে কতজন কত বলেছে, কত রকম কানাকানি করেছে, আমি তাতে কান দিইনি। এখন তো বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। তুমি মরবার ভয়ে অমন চুপ করে ছিলে বউমা। অমন ক'রে কেউ থাকে, দোর বন্ধ করলেই কি মরণকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। সে যেদিন আসবে সেদিন আসবেই।'

জয়া বলল, 'তা তো ঠিকই।'

রামদুর্গা বলল, 'ঠিক নয়। আমাকে ডাক্তার কবরেজ কতবার যে জবাব দিয়ে গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তাই বলে কি মরে গেছি। বিছানা ছেড়ে যেই উঠতে পেরেছি, ফের শুরু করেছি ঘর-সংসার। তোমার খুড়শ্বশুরের ভাত রেঁধেছি, ছেলেমেয়ের খেজমত করেছি, পাড়া-পড়শীর খোঁজখবর নিয়েছি। যতদিন আছি ততদিন তো আছি। যতদিন বাঁচি ততদিন তো বাঁচি। এই হোল গিয়ে আমার কথা।'

জয়ার হঠাৎ খেয়াল হোল। ঠিক ঠিক, একথা তো সে ভুলেই

গিয়েছিল। বাঁচতে হবে। যত রকমের মৃত্যুর ভয়ই হোক্ আর নৈতিক স্খলনই হোক, যুঝতে হবে তার সঙ্গে। বাঁচবার জন্তে সংগ্রাম করতে হবে। এই একবারের স্খলনকেই জয়া সবচেয়ে বড বলে একমাত্র বলে যেন মেনে না নেয়। কি হয়েছে এতে। এক পুরুষের কাছ থেকে আর একজন পুরুষের কাছে এসেছে। তার সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। তার সঙ্গে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এতে মরবার কি হয়েছে?

কিন্তু মনোতোষ, মনোতোষ তার স্বামী! মনোতোষ তার চির জীবনের সঙ্গী! এই বিদ্যাবুদ্ধিহীন সাধারণ একটি সাইকেল পিওনের সঙ্গে তাকে সারা জীবন ঘর করতে হবে, ওর ছেলেমেয়ের মা হতে হবে—এও কি ভাবা যায়। ভাবতেও যেন কান্না পেল জয়ার। না, জাত সে মানে না। হিন্দুদের বর্ণাশ্রমের বাঁধন সে অসঙ্কোচে ছিঁড়েছে। অমিয়কে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে তার কোন দ্বিধা হয়নি। সে জানত অমিয় বর্ণের দিক থেকে অব্রাহ্মণ হ'লেও বিদ্যায় বুদ্ধিতে, স্বভাবে প্রকৃতিতে তার বাবার মতই ব্রাহ্মণ। কিন্তু মনোতোষ তো তা নয়। মনোতোষ তো ভিন্ন জাতের। ভিন্ন প্রকৃতির। এবার সে সত্যি পড়েছে একজন অসবর্ণের হাতে। এবার তার সত্যিকারের পরীক্ষা।

সন্ধ্যাবেলায় বড একটা শালপাতার ঠোঙায় ক'রে দু' টাকার সন্দেশ নিয়ে এল মনোতোষ।

জয়া বলল, 'ও আবার কি।'

মনোতোষ বলল, 'হরির লুঠ দেব। মনে মনে মানত করেছিলাম, তুমি ভালো হ'লে সন্দেশ দিয়ে হরির লুঠ দেব। আর পাঁঠা দেব কালীবাড়িতে। কালী ঠাকরুণের পাওনা সামনের মাসে মাইনে পেয়ে শোধ দেব, হরিঠাকুরের প্রাপ্যটা আজ মিটিয়ে দেই।'

জয়া বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি যা তা বলছ, তুমি তো জানো, ওসব ঠাকুর-ফাকুর আমরা মানিনে।'

মনোতোষ হেসে বলল, 'আগে কি মানতে না-মানতে ছেড়ে দাও। এখন তো নতুন করে আমরা হয়েছি গো। আমি আর তুমি মিলে আমরা। ঠাকুর দেবতা আমি সব মানি, তাই তোমাকেও সব মানতে হবে। এখন আমার যা ধর্ম তোমারও সেই ধর্ম। ওসব ম্লেচ্ছ খৃস্টানী আমার ঘরে চলবে না। তুমি যে বামুনের মেয়ে, হিঁদুর মেয়ে, অমিয়দা তা তোমাকে ভুলিয়েই দিয়েছিল, আমি ফের মনে করিয়ে দেব। লাল পেড়ে শাড়ি পরে তুমি ফের লক্ষ্মীর আসন পাতবে, ধূপ দীপ জ্বেলে পুঁথি পড়বে, ভারি চমৎকার লাগবে দেখতে। আমি কালই সব ব্যবস্থা ক'রে দেব, দাঁড়াও। এখানে সব ঘরেই লক্ষ্মীর আসন আছে, আমাদের ঘরে থাকবে না, সেটা কি ভালো দেখায়।'

জয়া চুপ ক'রে রইল। তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে।

উঠানের এক কোণে টবের মধ্যে একটা তুলসী গাছ ছিল। মনোতোষ অন্যান্য ছেলেমেয়েদের ডেকে সেখানে জড়ো করল। ছেলে-মেয়েদের বাবা আর কাকারাও এলো কোন কোন ঘর থেকে। খানিক বাদে ছেলে বুড়োর মিলিত কোরাস শোনা গেল, 'হরি বোল, হরি বোল, যে দেবে হরির লুঠ তার হবে মঙ্গল।'

খানিকবাদে গীত থামল, কিন্তু গোলমাল থামল না। হিসেব ক'রে ছোট ছোট এক আনা দামের সন্দেশ নিয়ে এসেছিল মনোতোষ। তবু তাতেও দু'টাকায় মাত্র বত্রিশটি হয়েছে। কিন্তু ছেলে বুড়ো স্ত্রীলোকে মিলে লোক অনেক। সন্দেশের হরির লুঠ শুনে আশে পাশের বস্তি থেকে দশ পনেরটি ছেলেমেয়ে এসে পড়েছে। প্রত্যেকের হাতে এক-একটি সন্দেশ মনোতোষ এখন কি করে দেয়, তাই নিয়ে ঝগড়া, তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি।

জয়ার কানে গেল, কে যেন বলছে, 'সবাইয়ের হাতে যখন দিতে পারবে না, এত বড়লোকীপনা কেন বাপু। বাতাসা দিয়ে হরির লুঠ দিলেই হোত।'

কোন রকমে তাদের হাত এড়িয়ে মনোতোষ পালিয়ে এল ঘরে। এসে জয়াকে বলল, 'দেখলে কাণ্ডটা। এতো আমার বাপ মা'র শ্রাদ্ধ নয়, বিয়ে অন্নপ্রাশনও নয়, সামান্য হরির লুঠ। ছেলেপুলেদের ব্যাপার। তা গোটা বাড়িব বুড়ো মাগীমর্দ সবাই এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে। সন্দেশ যেন বাপের জন্মে কোন দিন চোখে দেখেনি। আমার তাই উচিৎ ছিল, বাতাসা দিয়েই হরির লুঠ দেওযা উচিৎ ছিল। বস্তির হরি ঠাকুরের সন্দেশ সইবে কেন।'

জয়া চুপ করে রইল। এইতো জীবন! এই কি জীবন?

সে শুধু স্বামী ত্যাগ করেনি, নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য-শিল্প সব ত্যাগ ক'রে এসেছে, সকলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছে। সেই সমাজে বুঝি আর ফিরে যাওয়া যাবে না। কেন যাবে না, পালিয়ে গেলেই হোল। স্বামীব ঘর থেকে পালিয়েছে, এখান থেকে ফের পালালেই হোল। কিন্তু পালাবে কোথায়। এই শিক্ষাহীন, সংস্কৃতিহীন, অন্নহীন, মানুষের দল শুধুতো এই বস্তিটির মধ্যেই নেই, এরা যে সমস্ত দেশ ভরে ছেয়ে রয়েছে, সমস্ত জগৎ ভরে ছেয়ে রয়েছে। না, পালাবার জো নেই জয়ার। স্বামীর ঘর থেকে পালিয়েছে, কিন্তু এদের ঘর থেকে পালাবার উপায় নেই তার। বাঁচতে হবে। একা নয়। একা বাঁচা যায় না। এদের সঙ্গে নিয়ে বাঁচতে হবে, এদের বাঁচাতে হবে। জয়া মনে মনে ভাবল, 'ডাক্তার বলেছেন আমি সুস্থ। কিন্তু আমি একা কতক্ষণ সুস্থ থাকতে পারব, একা কতক্ষণ সুখী থাকতে পারব। যদি সমস্ত দেশ সুস্থ না হয়, সমস্ত দেশ সুখী না হয়। যদি আমি চোখ বুজে না থাকি, কানে

আঙুল দিয়ে না থাকি, মরফিয়া ইনজেকশনে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে অসাড় ক'রে না রাখি, তাহলে এরা আমার চোখে পড়বেই. এদের কথা আমার মনে পড়বেই। আমার সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আমার শিক্ষা সংস্কৃতির বিলাসকে এরা বিষিয়ে তুলবেই, এদের আমি এড়াতে পারব না। এদের ফেলে আমি পালাতে পারব না। যেখানেই যাই এরা আমাকে ঘিরে থাকবে।'

এখানেই থাকবে জয়া, কিন্তু এমন করে লুকিয়ে থাকবে না, পালিয়ে থাকবে না, আত্মপ্রকাশ তাকে করতেই হবে, চাকরি-বাকরি খুঁজে নিতে হবে। এমন ক'রে লুকিয়ে সে ক'দিন থাকতে পারবে।

পরদিন মনোতোষকে দিয়ে কিছু পোস্টকার্ড, এনভেলপ আনাল জয়া। চিঠি লিখল নির্মলকে। বেনামীতে লিখল না, ঠিকানা, তারিখ, স্বাক্ষর, সম্বোধন সব দিয়ে চিঠি লিখল।

সেই চিঠি হাতে নিয়ে নির্মল ডাক্তার এসে উপস্থিত হোল অমিয়র বাসায়।

বাসা অমিয় ছাড়েনি। চল্লিশ টাকা ভাড়ায় দু'খানা ঘরই রেখে দিয়েছে। আশ্রয়হীন জন দুই দরিদ্র ছাত্র খবর পেয়ে এসে মাথা গুঁজেছে অমিয়র এখানে। তাদের ভরণপোষণও চালাতে হয়। অমিয়র নিজের ঘরে বন্ধুদের আড্ডা বসে। জয়া যখন হাসপাতালে ছিল, তখনও খালি বাসা পেয়ে দিনরাত বন্ধুরা এসে জড়ো হোত অমিয়র বাসায়। তখন বিরক্ত হোত না অমিয়, এখন হয়। এখন আর ভালো লাগে না। এখন একটু নিরিবিলি থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা পারে কই। লোকের কাছে দেখাতে হয়, এতে তার কিছুই হয়নি। কিছুই এসে যায়নি। কিন্তু এক এক দিন, এক এক রাত্রে দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি যেন যন্ত্রণায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে পড়ে।

জন কয়েক বাইরের লোক ছিল ঘরে। নির্মল তাদের বিদায় ক'রে দিয়ে বলল, 'অমিয়র সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা আছে।'

ওরা চলে গেলে অমিয় বলল, 'কি ব্যাপার ?'

নির্মল বলল, 'ব্যাপার একটু ঘটেছে এর মধ্যে। ওর খোঁজ পেয়েছি।'

অমিয় নিরাসক্ত থাকবার ভাণ ক'রে বলল, 'তাই নাকি, কি ক'রে খোঁজ পেলে।'

নির্মল বলল, 'সে নিজেই ইচ্ছে ক'রে খোঁজ দিয়েছে। চিঠি লিখেছে।'

অমিয় এবার আর তেমন নিরাসক্ত থাকতে পারল না, বলল, 'কই দেখি সে চিঠি।'

নির্মল বুকপকেট থেকে মুখ-ছেঁড়া একটা খাম বের ক'রে বলল, 'চিঠি তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নিই, এ চিঠির ওপরকার মানেটাকেই যেন একমাত্র মানে বলে মনে কোরো না। ভিতরে আর একটা মানে আছে। সেটা একেবারে উল্টো।'

অমিয় অসহিষ্ণুভাবে বলল, 'চিঠিটা আগে দেখি। মানেটা তোমার কাছে থেকে পরে বুঝে নেব নির্মল।'

নির্মল এরপর চিঠিটা অমিয়র হাতে দিল।

জয়া লিখেছে :

প্রীতিভাজনেষু

নির্মল, তোমরা যাকে টি-বি-র abcess ভেবে আমাকে অস্পৃশ্য করে রেখেছিলে, সেটা একটা সাধারণ ফোঁড়া। অপারেশনের পর ক্রমশ সুস্থ হচ্ছি। তেমনি তোমরা যে আচরণটাকে একটা মহাপাতক ভেবে আমাকে মনে মনে অস্পৃশ্য ভেবে রেখেছ, সামাজিক ব্যাকরণে সেটাও একটা সাধারণ ভুল মাত্র। সে ভুল আমি আমার

মত ক'রে শুধরে নিচ্ছি। পারতো বেলা এগারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে যে কোন একদিন এসো। সাক্ষাৎমত সব বলব শুনব। ইতি। জয়া।'

অমিয় কিছুক্ষণ গম্ভীর মুখে থেকে বলল, 'এর ভিতরকার মানেটা কি, তোমার টীকাটিপ্পনীটা এবার শুনি।'

নির্মল একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'এখন দেখছি ওই abcessটাই যত সর্বনাশের মূল। Wrong diagonisis আর ভুল চিকিৎসার ফলে আমার হাতে অনেক রোগীর অনেক ক্ষতি হয়েছে। কেউ কেউ মারাও গেছে। কিন্তু তোমাদের যেমন সর্বনাশটি হোল, তেমন আর কারোরই হয়নি। এমন ক্ষতি জীবনে আর কারোরই করিনি অমিয়। কিন্তু শুধু আমার কথার উপর কেন তুমি নির্ভর করলে! কেন অন্য ডাক্তার দেখালে না।'

অমিয় বলল, 'তুমি মিছামিছি দোষ দিচ্ছ নির্মল। তোমারও কোন দোষ নেই। একটা abcess-এর সাধ্য কি এমন সর্বনাশ ঘটায়, সাধ্য কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভেঙে দেয়, যদি ভিতরে মারাত্মক কোন গলদ না থাকে। সেই গলদটাই আসল। এ সম্পর্ক ভাঙতই। abcess না হলেও ভাঙত। যাকগে, তোমার টীকাটা এবার শুনি।'

নির্মল বলল, 'আমার মনে হচ্ছে জয়ার গভীর অপরাধবোধ, লজ্জা আর অনুশোচনাই তাকে এই চিঠি লিখিয়েছে। যা সে লিখতে চেয়েছে, তা সে লেখেনি। ঠিক উল্টোটা লিখেছে। ব্যাপারটিকে সাধারণ অপরাধ হিসেবে ভাববার মত মনের জোর নেই বলেই তার গলার জোর কলমের জোর অত বেশি। এবার আর রোগ নির্ণয়ে আমার ভুল হয়নি অমিয়।'

অমিয় অদ্ভুত একটু হাসল, 'হয়েছে বই কি। এবারও ভুল হয়েছে। দেখ নির্মল, ডাক্তারী তোমার ধাত নয়। তার চেয়ে ওকালতী

কর। দাগী আসামীদের জেল ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে খুব পসার জমাতে পারবে।' তারপর একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার কথার কোন মানে হয় না নির্মল। মানুষের মনের ভিতরে কি আছে না আছে তা দেখবার আমাদের সাধ্য নেই, আমরা তার আচরণটাই দেখতে পারি। সে আচরণ যদি সদাচার না হয়, তার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।'

স্বভাব আরো রুক্ষ হয়েছে অমিয়র, কথাবার্তা হয়েছে রূঢ়তর। কাজ আগের চেয়ে বেশি করছে, কিন্তু কোপন স্বভাবের জন্যে বন্ধুমহলে অপ্রিয়তাও তার বেড়ে চলেছে।

নির্মল বলল, 'তুমি যাই বলো, তাকে ভুল শোধরাবার সুযোগ আমাদের দেওয়া উচিৎ।'

অমিয় বলল, 'কিন্তু ভুল সে স্বীকার করছে কই।'

নির্মল বলল, 'সেইতো তার সব চেয়ে বড় ভুল। ভুল জেনেও স্বীকার করতে পারছে না, স্বীকার করার সাহস পাচ্ছে না। তার মনে এখনো আশঙ্কা আছে, যে তার অপরাধকে আমরা ক্ষমা করতে পারব না। কিন্তু অমিয়, এতো নেহতাই একটা accident ছাড়া কিছু নয়। আকস্মিক একটা দুর্ঘটনাকে আমরা কেন স্থায়ী করতে যাব।'

অমিয় চুপ ক'রে রইল।

নির্মল ফের বলতে লাগল, 'আমার ধারণা, জীবন সম্বন্ধে আশা না থাকায় চরম নৈরাশ্যবোধ থেকেই সে এই কাজ ক'রে বসেছে। এখন সে যখন বাঁচবার আশ্বাস পেয়েছে, তখন একটা মুহূর্তও আর তার পক্ষে সেখানে কাটানো সম্ভবপর নয়। তা তার চিঠির ঝাঁজ দেখেই বুঝতে পারছি। ভেবে দেখ মনোতোষের মত ছেলে তাকে কি দিতে পারে।'

অমিয় বলল, 'মনোতোষ না দেয়, অন্য কেউ দেবে।'

নির্মল বলল, 'ছিঃ, 'জয়া সে জাতের মেয়ে নয় অমিয়। কিন্তু আমরা

যদি ওকে তুলে না আনি, ওর ভুল ধরিয়ে না দিই ও একদিন জাতিভ্রষ্ট হতেও পারে।'

অমিয় চুপ ক'রে রইল।

নির্মল বলল, 'এক কাজ কর। চল আজই দুটো আড়াইটে নাগাদ আমরা দুজন যাই। গিয়ে নিয়ে আসি ওকে।'

অমিয় বলল, 'অসম্ভব, আমার অন্য কাজ আছে। আমি যেতে পারব না। যেতে হয় তুমি যাও।'

নির্মল বলল, 'আহা, আমি তো যাবই, কিন্তু সীতা উদ্ধারের জন্যে শুধু কি সুগ্রীবকে পাঠালেই চলে। রামচন্দ্রের নিজেরও সঙ্গী হওয়া দরকার।'

অমিয় বলল, 'যে সীতা ইচ্ছে ক'রে রাবণের হাত ধ'রে রথে ওঠে, রাম তো ভালো, রামের বাবা দশরথেরও সাধ্য নেই তাকে উদ্ধার করে। ওসব কাব্যচর্চা রাখ নির্মল, যেতে হয় তুমি যাও।'

নির্মল বলল, 'তুমি যাবে না?'

অমিয় বলল, 'না নির্মল। অযাচিত ক্ষমায় কোন ফল হয় বলে আমার বিশ্বাস হয় না। দোষ করেছে সে, নিজের দোষ সে বুঝুক। এগিয়ে এসে ক্ষমা চাক। তবে আমি ক্ষমা করব। তার সব দোষ ক্ষমা করব। সেই মার্জনাই আসল মার্জনা নির্মল।'

আরো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থেকে নির্মল উঠে পড়ল। তার রোগী দেখবার সময় হয়েছে।

যাই যাই ক'রে আরো দু'একদিন দেরি করল নির্মল। তারপর একদিন বিকেলের দিকে গিয়ে হাজির হোল তের নম্বর বস্তিতে।

এর মধ্যে খবরের কাগজ দেখে দেখে চাকরির জন্তে কয়েকখানা দরখাস্ত পাঠিয়েছে জয়া। মাস্টারী হোক, কেরানীগিরি হোক, একটা কিছু হলেই হয়। যত দিন না হয়, ততদিন হাত পা কোলে ক'রে ব'সে

থেকে লাভ কি। বস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে জয়া এক পাঠশালা খুলেছে। সেই পাঠশালায় পড়াচ্ছিল জয়া। এর মধ্যে সদরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল।

জয়া ক্লাসের একটি মেয়েকে ডেকে বলল, 'যাও তো লীলা, দেখ তো কে ডাকছে।'

লীলা উঠে গিয়ে ফিরে এসে বলল, 'প্যাণ্টপরা এক ভদ্রলোক। নাম বললেন নির্মল দত্ত। জয়া দাসকে চাইছেন। আমি বললুম এখানে জয়া দাস বলে তো কেউ থাকেন না। জয়া মান্না আছেন, আমাদের দিদিমণি। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকেই ডেকে দাও। দাস বুঝি আপনার বাপের বাড়ির পদবী ছিল দিদিমণি? উনি বুঝি আপনার তখনকার বন্ধু?'

লীলা ঠোঁট টিপে একটু হাসল। ক্লাসের মধ্যে লীলা চক্রবর্তী সব চেয়ে বড়। তের চৌদ্দ বছর বয়স হয়েছে ওর। দেখতে আরো কিছু বেশি দেখায়। পড়াশুনা ছাড়া আর সব বিষয়েই পাকা।

জয়া একটুকাল চুপ ক'রে রইল। দেখা করবে কি করবে না। কি ক'রে দেখাবে মুখ। চিঠি লেখার সময় ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন বুকে কাঁপছে, পা কাঁপছে। কি বলবে সে? তার বলবার কি আছে? কিন্তু লীলা অপেক্ষা করছে, দরজায় অপেক্ষা করছে নির্মল।

জয়া হঠাৎ সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে তীব্র স্বরে বলল, 'হ্যাঁ বন্ধু। যাও ডেকে নিয়ে এসো।'

তারপর স্কুল ছুটি দিয়ে জয়া চলে গেল নিজের ঘরে। একটু বাদে লীলার পিছনে পিছনে নির্মল এসে ঢুকল। লীলা দরজার কাছ থেকে নড়তে চায় না। জয়া বিরক্ত হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'যাও লীলা, তুমি ঘরে যাও, তুমি কি করছ এখানে। ঘরে যাও।'

লীলা বলল, 'যাচ্ছি দিদিমণি।'

তারপর সরে গেল।

জয়া সশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

বাড়ির নানা বয়সী মেয়েরা সেই শব্দ শুনল। নির্মলকে দেখল ঘরে যেতে, তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। কেউ বা বলল, 'কালে কালে কত কাণ্ডই দেখব। দিনে দুপুরে—বন্ধু! পুরুষ মানুষ আবার মেয়ে মানুষের বন্ধু হয়!'

বসবার উঁচু কোন আসন ছিল না। জয়া একটা মাদুর বিছিয়ে দিল নির্মলকে। কড়া ইস্ত্রী করা সুট নিয়ে অতি কষ্টে সেই মাদুরের ওপর বসল নির্মল। তারপর চার দিকে একবার তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'ঈস, লক্ষ্মীর আসন পর্যন্ত পাতা হয়ে গেছে দেখছি। একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত।'

জয়া কথা বলল না, মুখ তুলল না। মনোতোষ তার কোন মানা শোনেনি। ঘরে লক্ষ্মীর আসন পেতে গৃহস্থের সব অমঙ্গল দূর করেছে।

আরো একটুকাল চুপচাপ থাকবার পর নির্মল ডাকল, 'জয়া।'

সামনা সামনি কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকতে পারবে জয়া। মুখ ওকে তুলতেই হোল, মুখ ওকে খুলতেই হোল।

বলল, 'বল।'

নির্মল বলল, 'বলবার মাত্র একটি কথাই আছে জয়া। চল যাই, আজই চল।'

জয়া একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তা আর হয় না নির্মল।'

নির্মল বলল, 'কেন হয় না? জীবনে একটা ভুল করেছ বলেই সারা জীবন সেই ভুলকে আঁকড়ে থাকতে হবে, তার কি মানে আছে? দেহের শুচিতার নামে শুচিবায়ুতাকে আর যেই দিক আমরা অন্তত প্রশ্রয় দিতে পারিনে।'

জয়া ফের খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'এ তা নয় নির্মল, শুচিবায়ুতার কথা নয়। কর্তব্যবোধ না হোক ভদ্রতা বোধের কথা। যেতে আমি চেয়েছিলুম। তোমার বন্ধুর ওখানে স্থান না হোক, অন্য যে কোন জায়গায়। কিন্তু ও বলল কি জানো, 'তুমি অসুস্থ হয়ে আমার সঙ্গে এসেছিলে, এখন সুস্থ হয়ে সরে পড়তে চাও। আমাকে মরবার জন্যে সঙ্গে ডেকেছিলে, তাতে তোমার লজ্জা হয়নি। আমাকে নিয়ে বাঁচতে তোমার লজ্জা'।'

একটু বাদে নির্মল বলল, 'কিন্তু এসব তোমার বাজে sentiment জয়া। সত্যি সত্যিই তো তুমি আর ওকে মারনি। রোগের বীজ সংক্রামিত করোনি। গাছের পরিচয় যেমন তার ফলে, কাজের পরিচয়ও তেমনি। কাজকে আমরা ঠিক তার ফল দিয়েই বিচার করব। সত্যিইতো ওর মারাত্মক কোন ক্ষতি তুমি করোনি। যেটুকু ক্ষতি হয়েছে, সেটুকু পূরণ হ'তে বেশি সময় নেবে না। ওর সমস্ত জীবন রয়েছে সামনে। দু'দিন বাদে বিয়েথা করে ও বেশ সুখী হ'তে পারবে। কিন্তু তুমি একটা ভুলকে আঁকড়ে থেকে এমন করে নিজেকে নষ্ট কোরো না আত্মহত্যা কোরো না জয়া।'

কথা শেষ ক'রে নির্মল সিগারেট ধরাল।

বস্তির দুটি বউয়ের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া বেঁধেছে চড়া গলায়, অশ্লীল গালিগালাজ শুরু হযেছে তাদের। কাঁচা নর্দমা থেকে অনবরত একটা দুর্গন্ধ আসছে।

জয়া আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি শুধু আমার আত্মহত্যাটাই দেখলে নির্মল। আর এদের হত্যাটা তোমার চোখে পড়ছে না ?'

নির্মল বলল, 'পড়বে না কেন জয়া, পড়েছে। কিন্তু সে হত্যা কি তুমি এইভাবে বন্ধ করতে পারবে ? একটা পাঠশালা খুলে একটা শিল্পাশ্রম খুলে বন্ধ হবে সেই হত্যা ?'

জয়া বলল, 'তা হয়ত হবে না। কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে। গঠনেরও প্রয়োজন আছে নির্মল। সেই প্রয়োজনকে হয় তোমরা স্বীকার কর না, না হয় তার জন্যে যে ধৈর্য, যে সহিষ্ণুতা যে ত্যাগের দরকার হয়, তা তোমাদের নেই। তোমরা ভাব আগে ভেঙে নিই, তারপর গড়ব। তা হয় না নির্মল। একটা দেশ, একটা জাতি তো আর একটা মাটির ঢেলা নয় যে, অত সহজে তাকে ভাঙা-গড়া চলে। ভাঙতে হলেও একজনের হাত দিয়ে ভাঙা যায় না। দু চারজনের হাত দিয়েও নয়। কোটি কোটি হাতের দরকার হয়। সে হাতে বল জোগানোটাই গড়নের কাজ। তা কই তোমাদের।'

নির্মল বলল, 'জয়া, নিজের ব্যক্তিগত দুঃখে তুমি আজ অভিভূত। তাই কেবল একটা দিকই দেখছ, আর একটা দিকে তোমার চোখ পড়ছে না। তুমি ভেবে দেখ কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। আমাদের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে কর্মী কত কম। রাজনৈতিক চৈতন্য কত কম। এরা শুধু জানে নিজের নিজের পরিবারটিকে। তাকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত। আর ব্যস্ত সমালোচনা করতে। কাজ করবে না, কাজের জন্য এগিয়ে আসবে না। শুধু সমালোচনা করবে। সেইজন্যেই তো রাগ হয়—'

জয়া বলল, 'কিন্তু রাগ হলে চলবে না নির্মল। অমিয়কেও'—বলে জয়া একটু থেমে গেল, তারপর ফের বলল, 'অমিয়কেও দেখেছি রাগ করতে। কথায় কথায় ধৈর্য হারাতে। কিন্তু আমার তো মনে হয়, তাতে ফল খারাপই হয়েছে। যার সঙ্গে সামান্য মতভেদ হয়েছে, তাকেই তোমরা কেবল গাল পেড়েছ, বলেছ তুমি দালাল, তুমি স্পাই। কিন্তু নির্মল, দেশ ভরেই তো এরা। কাকে তুমি বাদ দেবে। ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে না?

নির্মল বলল, 'কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, এদের নৈষ্কর্ম্য, এদের ভণ্ডামি, এদের প্রতিক্রিয়াশীলতাকে সহ্য করতে হবে? ঘা মেরে মেরে এদের জাগাতে হবে না?'

জয়া বলল, 'না নির্মল। জাগাতে হবে, কিন্তু ঘা মেরে মেরে নয়। ঘা যেখানে মারবার, সেখানে মেরো, তার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করো। আমি অনেকদিন তোমাদের মধ্যে ছিলাম না। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে অমিয়র দিন রাতের পরিশ্রমের কথা শুনেছি, আর তোমাদের কথা ভেবেছি। ভেবেছি কি হচ্ছে, দেশ ভরে এসব কি হচ্ছে। এক একটি রাজনৈতিক দলে দু' তিনটি করে উপদল। যেন সেকালের অসংখ্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মঠে দেশ ছেয়ে গেছে। প্রত্যেক মঠ থেকে বলা হচ্ছে নান্যঃ পন্থা। আসল লোভ তোমাদের আধিপত্যের ওপর। রাজনীতির এই এক অভিশাপ। কর্মীরা স্ত্রী ত্যাগ করতে পারে, পুত্র ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু দলীয় আধিপত্য ত্যাগ করতে পারে না। প্রত্যেকের মনেই ছোট ছোট সিংহাসনের স্বপ্ন।'

নির্মল বলল, 'জয়া।'

'বল।'

নির্মল বলল, 'আচ্ছা থাক, শেষ কর তোমার কথা।'

জয়া বলল, 'কথার কি আছে। তোমরা কেন মিশতে পারছ না নির্মল, কেন এই ছোট ছোট মঠ ভেঙে দিয়ে বড় এক মাঠে মিলতে পারছ না। তোমাদের মতান্তর মনান্তরের আর শেষ নেই। দেখ, মানুষের চেয়ে শাস্ত্রকে বড় ক'রে আমাদের দেশ একদিন মরেছিল। ফের যেন সেই দশা দেখতে পাচ্ছি। সেই গোঁড়ামি সেই ধর্মান্ধতা, সেই গুরুবাদ সব যেন ফিরে ফিরে আসছে।

জয়া থামল।

নির্মল বলল, 'তোমার মন আজ বিক্ষিপ্ত। এসব আলোচনা আর

একদিন করা যাবে। তুমি যে ব্যাঙের ছাতার মত মঠগুলির কথা বললে, সে মঠগুলিও বিনা কারণে গজায় নি। সেগুলিও আমাদের নানান শ্রেণী উপ-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতীক, নানা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণেই এরা গজিয়েছে। সামাজিক কারণে ক্রমে এরা মিলিয়েও যাবে। জোর করে একদিনে সব উপড়ে ফেলা যাবে না। জোড়াতালি-দেওয়া মিলে কোন লাভ নেই।'

জয়া হেসে বলল, 'একেবারেই যে লাভ নেই, তা মানতে পারিনে। প্রথম প্রথম মিল না হয় জোড়াতালির মিলই হোল। তারপর একসঙ্গে কাজ করতে করতে তালিটা খসবে, জোড়ার দাগটা মিলিয়ে যাবে। সামাজিক নিয়মের কথা বললে। সে নিয়ম তো আছেই। কিন্তু সে নিয়ম তো প্রাকৃতিক নিয়মের মত দুর্লঙ্ঘ্য নয়। সামাজিক নিয়ম সামাজিক মানুষের নড়া-চড়ায় রোজ রোজ বদলায়, তাকে বদলে নিতে হয়। সত্যিকারের বিপ্লব তো সেইখানে।'

নির্মল হাতঘড়ির দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে বলল 'আমার উঠবার সময় হোল জয়া। তুমিও ওঠো। চল, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

জয়া হেসে বলল, 'বল কি, মনোতোষকে না বলেই পালাব।'

নির্মল বলল, 'একেবারে না বলে নয়। সেবারকার মত চিঠিতে বলে এসো।'

জয়া বলল, 'না, নির্মল, তা হয় না। এভাবে একা একা পালাতে পারব না।'

নির্মল বলল, 'একা একা কেন, আমার সঙ্গে পালাবে। আমি কি তোমার একদিনের পলায়নেরও সঙ্গী হতে পারি নে?'

বলে নির্মল মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

জয়াও বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয় নির্মল। এ কথা শুনলে

নীলিমা ঝাঁটা হাতে ছুটে আসবে না? কেমন আছে নীলি, কেমন কেমন আছে টুলু-বুলুরা?'

নির্মল বলল, 'ভালো আছে। তা হলে এবার আমি উঠি। তুমি ভেবে দেখ। অমিয়র দোর তোমার জন্তে খোলাই আছে। তার উদারতার কথা তোমার কাছে নতুন করে বলবার দরকার নেই। তাকে তুমি আমাদের সকলের চেয়ে বেশি চেন'। কিন্তু আর বেশি দেরি কোরো না।'

নির্মল উঠতে যাচ্ছিল জয়া বাধা দিয়ে বলল, 'বোসো, একটু চা খেয়ে যাও।'

নির্মল বলল, 'চা খাব? দাও।'

পাশের ঘরের উনুন থেকে চায়ের জল গরম করে আনবার জন্তে জয়া যেই দোর খুলেছে, অমনি এক পাশ থেকে লীলা সরে দাঁড়াল।

জয়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তুমি এখানে কি করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না দিদিমণি, এমনই দাঁড়িয়েছিলাম।' লীলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

জয়া আর কোন কথা বলল না।

চা খেয়ে নির্মল বিদায় নিল। যাওয়ার সময় আর একবার অনুরোধ ক'রে গেল, 'দেরি কোরো না।'

জয়া খানিকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। ফের তাকে হাতছানি দিচ্ছে সভ্যজগৎ স্বামীর ঘর। গেলেই হয়; কিন্তু যাওয়া তো সোজা নয়। ফেরার পথ দুর্গম হয়ে গেছে জয়ার কাছে। ঘরের দোর খোলাই আছে। কিন্তু হৃদয়ের দোর? তাও কি খোলা রাখতে পেরেছে অমিয়? না কি আজীবন সেই রুদ্ধ দ্বারের কাছে জয়াকে মাথা কুটে মরতে হবে। এক সঙ্গে থাকবে, এক সঙ্গে ঘর-সংসার করবে, কিন্তু ঠিক সঙ্গিনী আর হ'তে পারবে না। দুজনের মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম ব্যবধান

থেকেই যাবে। ভৌগোলিক দূরত্বের চাইতে সে ব্যবধান দুরতিক্রম্য। তাছাড়া আছে মনোতোষ! ওর সম্বন্ধেও কি কোন দায়িত্ব নেই জয়ার? সব বোঝাপড়া কি শেষ করতে পেরেছে?

কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারে না জয়া। চিন্তার জট কেবল জড়ায়, কেবল জড়ায়। কিন্তু সব জট, সব জাল ছিঁড়তে পারত অমিয়। সে যদি এসে সামনে দাঁড়াত, যদি ধরত এসে হাত, জয়া তার মুখের দিকে হয়ত তাকাতে পারত না, কিন্তু বুকের মধ্যে মুখ লুকোতে পারত। বলতে পারত, 'আমার সব লজ্জা তুমি ঢেকে দাও, আমার সব কলঙ্ক আবৃত ক'রে রাখ।'

কিন্তু অমিয় তো নিজে এল না। শুধু দূর থেকে বলে পাঠাল, 'তোমাকে ক্ষমা করেছি।' কিন্তু এ ক্ষমায় বিশ্বাস কি। কে জানে এ ক্ষমা তার ঘৃণার চেয়ে, বিদ্বেষের চেয়েও দুঃসহ হবে না। কে জানে তখন প্রতি মুহূর্তে জয়াকে বলতে হবে না, 'কেন এলাম, কেন এলাম!'

সন্ধ্যার পর মনোতোষ ঘরে এসে ঢুকল। দু' দুটো কাজ নিয়েছে মনোতোষ। দুটোই সাইকেল পিওনের কাজ। এক মনিবকে বলেনি আর এক মনিবের কথা। প্রত্যেকের কাছেই এমন ভাব দেখাচ্ছে, 'তুমিই একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

কিন্তু বড় পরিশ্রম হয়। তবু পরিশ্রমকে ঠিক পরিশ্রম বলে মনে হয় না মনোতোষের। এখনকার খাটুনিতে রস আছে, আনন্দ আছে। এখনকার কষ্ট শুধু একার জন্যে নয়, দুজনের জন্যে।

ঘরে ঢুকে মনোতোষ বলল, 'একি, ঘরে এখনো আলো জ্বালো নি যে। অন্ধকারে বসে আছ। তেল নেই নাকি হ্যারিকেনের?'

'আছে।'

বলে উঠে পড়ল জয়া। হ্যারিকেন জ্বালাল।

মনোতোষ খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ দেখতো এখন কেমন সুন্দর দেখা

যাচ্ছে। এমন রূপ, এমন চেহারা কি অন্ধকারে লুকিয়ে রাখবার জন্তে নাকি। হ্যারিকেন তো ভালো, আমার ক্ষমতা থাকলে ডেলাইট জালিয়ে রাখতুম। হরলাল কাকার সঙ্গে কথাবার্তা বলছি। শিগ্‌গিরই বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক লাইট আনিয়ে নেব। তখন দেখ এ ঘরের চেহারা কেমন হয়, নাও ধরো।'

বলে পকেট থেকে এক শিশি মাথার তেল আর এক শিশি তরল আলতা বের ক'রে মনোতোষ দিল জয়ার হাতে।

জয়া বলল, 'এ কি, এসব আবার এনেছ কেন। আলতা দিয়ে কি হবে। কে পরবে আলতা।'

মনোতোষ মুখ টিপে হাসল, 'কে আবার পরবে। আমি পরব। কে পরবে যেন উনি জানেন না। নিজের হাতে যদি পরতে লজ্জা করে, আমাকে বোলো, ঘরে দোর দিয়ে কোলের ওপর পা নিয়ে আমি পরিয়ে দেব। তাহলে তো আর কোন আপত্তি থাকবে না। নাও, রাখো।'

তারপর গায়ের জামাটা খুলে ফেলল মনোতোষ। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এ কি ঘরটা ভালো ক'রে ঝাঁটও দাওনি। শরীর ফের খারাপ হোল নাকি তোমার। আচ্ছা, আমি দিচ্ছি ঝাট। এ কি, সিগারেটের টুকরো এলো কোত্থেকে এখানে ?'

বিস্মিত হয়ে মনোতোষ জয়ার মুখের দিকে তাকাল।

জয়া হঠাৎ কোন জবাব দিল না।

মনোতোষ আবার বলল, 'কেউ এসেছিল নাকি ? কে এসেছিল ?'

জয়া এবার বলল, 'নির্মল।'

মনোতোষের মুখ গম্ভীর হোল, বলল, 'সেই নির্মল ডাক্তার ? সে আবার কেন এল এখানে ? কি করে এল, ঠিকানা জানল কি করে ?'

জয়া বলল, 'ঠিকানা আমিই জানিয়েছি। আমিই তাকে চিঠি লিখেছি আসতে।'

মনোতোষ বলল, 'কেন, তাকে আবার তোমার কি দরকার পড়ল ? শরীর খারাপ করে থাকে এ পাড়ায় ডাক্তার কবরেজ ছিল না ?'

জয়া বলল, 'শরীর খারাপ করবার জন্যে ডাকিনি। এমনিই ডেকেছি।'

'ওঃ, এমনিই গল্প করার জন্যে ?'

জয়া বলিল, 'হ্যাঁ, গল্প করার জন্যে।'

মনোতোষ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'একদিন এসেছে, এসেছে। ও যেন আর কোনদিন এখানে না আসে। ওর সঙ্গে বেশি গল্প-টল্প করা মোটেই ভালো নয়।'

মনোতোষের মুরুব্বিয়ানায় জয়ার হাসি পেল, বলল 'কেন, বল তো ?'

মনোতোষ বলল, 'কেন আবার সুবিধের নয় লোকটি।'

জয়া হাসি চেপে বলল, 'কেন, অসুবিধের কি দেখলে, বিয়ে করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে।'

মনোতোষ বিরক্ত হয়ে বলল, 'থাম, থাম। বিয়ে করলে আর ছেলেপুলে হলেই বুঝি সবাই সাধু হয়ে যায়; না ?'

জয়া আস্তে আস্তে বলল, 'সবাই হয় না অবশ্য।'

মনোতোষ বলল, 'তাছাড়া ও সব বন্ধুবান্ধবদের এই বাড়িতে নিয়ে আসা কি ভালো। কতজনে কত কি মনে করতে পারে। কি দরকার। একেই তো কত সাবধানে থাকতে হচ্ছে। ঘর মোটে পাওয়া যায় না আজকাল। জানো তো শহরের অবস্থা ! হঠাৎ যদি এখান থেকে উঠে যেতে হয় একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।'

মনটা অপ্রসন্ন হয়ে রইল মনতোষের। মুখখানা ভার ভার। ভালো লাগছে না, কিছু ভালো লাগছে না। অথচ একটু আগে জয়ার হাতে গন্ধ তেল আর আলতার শিশি তুলে দিতে কি চমৎকারই না লাগছিল। রসে ভরে উঠেছিল মন। মুখ থেকে যা বেরুচ্ছিল তাই রসাল হচ্ছিল। হঠাৎ যেন সমস্ত রস

শুকিয়ে গেছে। নির্মল ডাক্তারকে আবার কেন খবর দিল জয়া? ওদের জয়ার ফের কিসের দরকার? অন্য কোন মেয়ে হলে তো লজ্জায় মুখই দেখাতে পারত না। শহরে পাশ করা মেয়েদের হালচাল বোঝা ভার। জয়া কি ফের পালাবার মতলব করছে, সরে পড়বার চেষ্টা করছে? কিন্তু জয়া যা ভেবেছে তা হবে না। কিছুতেই পালাতে দেবে না মনোতোষ।. ওর মন চঞ্চল হয়েছে বুঝলেই মনোতোষ ওকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে। কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও নিয়ে থাকবে। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। বনে বনে লুকিয়ে থাকবে। তবু ছাড়বে না জয়াকে।

কিন্তু একটু বাদে ফের মনোতোষ ভাবল, সত্যি তা তো আর সম্ভব নয়। তার অত টাকা কোথায় যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। খাবে কি। রোজগার করার জন্যে তাকে কলকাতার শহরেই থাকতে হবে। অথচ দিন রাত ঘরে বসে পাহারা দিতে পারবে না। তালা চাবি দিয়ে যে আটকে রেখে যেতে পারবে তাও নয়। শিক্ষিতা মেয়ে। শাসন তিরস্কারেও কোন ফল হবে না। বরং তাতে আরো বিগড়ে যেতে পারে। রাখতে হলে আদর সোহাগ দিয়ে মন জুগিয়েই রাখতে হবে। বড় ভুল হয়েছে মনোতোষের। এর মধ্যে একদিন একটা সিনেমা দেখিয়ে আনা উচিত ছিল। সামনের শনিবার যেমন ক'রেই পারুক দু'খানা টিকেট আনাবেই মনোতোষ। মেয়ে মানুষের মন তো, একটু রঙতামাসা না হ'লে কি ভালো লাগে।

জয়া মুখ ফিরিয়ে শুয়ে শুয়ে নিজের কথা ভাবছিল। আর ভাবছিল মনোতোষের কথা। একটু একটু ক'রে সবই শুরু হয়েছে। ওর অদ্ভুত ঈর্ষা আর অভিভাবকত্বের ভঙ্গি দেখে আজ হাসতে পারছে জয়া, কিন্তু চিরদিনই কি পারবে? ব্যাপারটা তো আসলে হাসির নয় যে হাসবে। হাসাটা তো সত্যি সত্যি উচিত হবে না যে হাসবে। মনো-

তোষ ক্রমে সমস্ত স্বাধীনতা থেকে জয়াকে বঞ্চিত করবে, শিক্ষা সংস্কৃতির জগৎ থেকে তাকে সরিয়ে রাখবে। মনোতোষের স্ত্রী—এ ছাড়া তার আর কোন পরিচয় থাকবে না। এই অধঃপতন, পরম অবাঞ্ছিত এই পরিণতি থেকে কি রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই? জয়াও কি অসহায় অদৃষ্টবাদীর মত শেষপর্যন্ত ভাগ্যকে বিশ্বাস করবে, সঙ্গের পুরুষটিকে মনে করবে ভাগ্যের প্রতীক? কিন্তু জয়া ওর কাছে দুর্বল হোল কেন, দুর্বল হবে কেন, সব দিক থেকে বড হয়েও কেন ছোট সেজে থাকবে?

'তুমি রাগ করেছ?'

মনোতোষ জোর ক'রে ওর দিকে জয়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের কোমল স্বরে বলল, 'তুমি রাগ করেছ?'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ করেছি।'

'কেন? রাগ করেছ কেন বউ?'

জয়া বলল, 'নিজেই চিন্তা ক'রে দেখ কেন করেছি। তুমি আমাকে কি ভেবেছ বল তো? নিরক্ষরা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ভেবেছ আমাকে যে তুমি যা বোঝাবে, যা হুকুম করবে, ভালো হোক মন্দ হোক তাই তামিল করব? আমার পড়াশুনো থাকবে না, কাজকর্ম থাকবে না, বন্ধুবান্ধব থাকবে না, কিছু থাকবে না? তোমার এই চার দেয়ালের মধ্যে আমাকে দিন রাত আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে? তা যদি ভেবে থাক খুব ভুল করেছ, খুব ভুল করেছ।'

মনোতোষ নরম হয়ে বলল, 'খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার। কিন্তু আমার যে ভয় হয়।'

জয়া বলল, 'কিসের ভয়?'

মনোতোষ বলল, 'পাছে তুমি চলে যাও, পাছে তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়ে যাও।'

জয়া কোন কথা বলল না।

মনোতোষ বলতে লাগল, 'আমার বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, টাকা রোজগারের ক্ষমতা নেই, কোন জোরই তো নেই আমার। কি দিয়ে আমি তোমাকে ধরে রাখব।'

বলতে বলতে জয়াকে সবলে বুকে জড়িয়ে ধরল মনোতোষ। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জয়া বলল, 'কোন জোর না থাক, তোমার ভালোবাসার জোর তো আছে। মানুষকে ধরে রাখবার সেই তো সবচেয়ে বড় জোর মনোতোষ।'

দিন কয়েকের মধ্যে নির্মল এল না দেখে সেদিন সন্ধ্যার পর অমিয়ই খোঁজ নিতে গেল ওর। আমহার্স্ট স্ট্রীট আর সুকিয়া স্ট্রীটের মোড়ে ওর ডিসপেন্সারি।

জনকয়েক রোগী ছিল, নির্মল তাদের বিদায় দিয়ে বলল, 'এসো. কি ব্যাপার।'

অমিয় ওর সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বলল, 'ব্যাপার বড অদ্ভুত নির্মল। মানুষের সময় যখন খারাপ পড়ে, তখন তার অকৃত্রিম বন্ধুরাও কৃত্রিম ব্যবহার শুরু করে দেয়! তুমি গেলে না কেন? গিয়ে তোমারই তো খবর দেওয়ার কথা ছিল। তুমি কি ভেবেছ আমি শুধু সুখবর পাওয়ার জন্যেই হা-পিত্যেশ করে বসেছিলাম, যে কোন খবরের জন্যেই তৈরী ছিলাম না?'

নির্মল একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সময় করে উঠতে পারিনি অমিয়। কাজকর্মের চাপ ক'দিন ধরে বড় বেশি ছিল। শোন, আমি বলি কি, তুমি আর একদিন যাও, বরং আমিও সঙ্গে যেতে রাজী আছি। দুজনে মিলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—'

অমিয় বলল, 'হুঁ, তারপর?'

নির্মল ইতস্তত করে বলল, 'মনে হচ্ছে আরো কিছু সময় দিতে হবে ওকে।'

অমিয় উত্তেজিতভাবে বলল, 'আরো সময় ? অসম্ভব। আর একটি দিন একটি মিনিটও আমি ওকে দিতে পারব না, নির্মল। আমি আমার কর্তব্য ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

নির্মল বলল, 'কি ঠিক করেছ।'

অমিয় বলল, 'ডিভোর্স।'

নির্মল একটু চমকে উঠে বলল, 'না অমিয়, অন্তত এত তাড়াতাড়ি ওসব করতে যেয়ো না।। দেখা যাক আরো কিছু দিন।'

অমিয় বলল, 'তোমাকে তো বলেছি আর একটি দিনও নয়, সম্পর্ক-চ্ছেদ তো হয়েই গেছে। কাগজ কলমে যেটুকু আছে, সেইটুকুই শুধু মুছে দেওয়া বাকি, তার জন্যে আর মায়া ক'রে লাভ কি।'

নির্মল কোন কথা বলল না।

অমিয় বলল, 'ভেবে দেখ আমি অন্যায় কিছু করছিনে। এ-অবস্থায় যে কোন ভদ্রলোক আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে যা করত আমিও তাই করছি। এর পর একটি ব্যভিচারিণী নারীর নাম নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে আমার সম্মানে বাধে।'

নির্মল বলল, 'তুমি কি কোর্ট পর্যন্ত যেতে চাও?'

অমিয় বলল, 'নিশ্চয়ই। এর মধ্যে গোপন করবার তো কিছু নেই, চাপাচাপিরও কিছু নেই। আমার দিক থেকে তো কোন লজ্জার কারণ ঘটেনি। আমি তো কোন অন্যায় করিনি। তাছাড়া এই হোল সবচেয়ে কম শাস্তি। শাস্তিও একে ঠিক বলতে পারো না। আইনের দিক থেকে এ হোল পথ পরিষ্কার করে দেওয়া, পথ পরিষ্কার ক'রে রাখা।'

নির্মল বলল, 'কিসের পথ পরিষ্কার অমিয়।'

'কিসের আবার, বিয়ে-থা'র। তোমরা কি ভেবেছ আমি চিরকালই এমন বাউণ্ডুলে হয়ে থাকব নাকি? ফের বিয়ে-থা করব না? এক

বস্তু পালিয়েছে বলে অন্তত আরো দু' একবার experiment ক'রে দেখব না ?'

অমিয় একটু হাসল।

নির্মল বলল, 'তা তো ঠিকই।'

জয়ার ভাবভঙ্গি দেখে নির্মলের মনেও সন্দেহ হচ্ছিল। ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে জয়া কেন ছুটে এল না অমিয়র কাছে। জয়া তো চেনে তার স্বামীকে। অমিয়র ওপরটা যত রুক্ষ, যত কঠিনই হোক, ভিতরটা যে স্নেহকোমল, তাতো তার জানতে বাকি থাকবার কথা নয় তবু কেন আসছে না জয়া! তবু কেন দেরি করছে ? তবে কি সে আসলে মনোতোষকে নিয়েই পরিতৃপ্ত ? জৈব তৃপ্তিটাই কি মেয়েদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা ?

অমিয় উঠে পড়ল, 'আমি এবার যাই নির্মল। ডিউটির সময় হয়ে এল।'

নির্মল বলল, 'আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু ক'রে ফেল না যেন অমিয়। আমাদের ভেবে দেখতে দাও। পরামর্শ করতে দাও।'

অমিয় একটু হাসল, 'এসব ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শের চাইতে উকিলের পরামর্শটাই বেশি কাজে লাগবে নির্মল। আচ্ছা যাই এবার।'
দিনকয়েক বাদে উকিলের সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক ক'রে এসে নির্মলকে সে কথা জানিয়ে দিল অমিয়।

নির্মল অপ্রসন্ন হয়ে বলল, 'তুমি আমাদের কারো কথাই শুনলে না! এত তাড়াতাড়ি এসব করবার কি সত্যিই কিছু দরকার ছিল ? যাক্ তুমি যা ভালো বুঝেছ করেছ। কিন্তু আমার মনে হয়, কোর্টে যাওয়ার আগে একবার জয়ার কাছে তোমার যাওয়া উচিত। তুমি যে এই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ তা তাকে আগে একবার জানানো দরকার।'

অমিয় একটু হাসল, 'সে কি আমাকে আগে কিছু জানিয়েছিল? বেশ, তার ওপর তোমার যখন এত দরদ তুমিই না হয় জানিয়ে দিয়ো।'

স্ত্রীর সঙ্গেও এসম্বন্ধে পরামর্শ করল নির্মল। নীলিমা বলল, 'অমিয় বাবু যদি ডিভোর্স স্যুট করেনই, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না, ছ' মাস তো কাটল। তিনিই বা আর কত দিন অপেক্ষা করবেন।'

নির্মল বলল, 'কিন্তু ডিভোর্স একবার হয়ে গেলে তো সব শেষ হয়েই গেল।'

নীলিমা বলল, 'তোমার যেমন কথা, যেন শেষ হ'তে আর কিছু বাকি আছে।'

স্ত্রীর ওপর প্রসন্ন হ'তে পারল না নির্মল। জয়ার ওপর নীলিমার কোন সহানুভূতি নেই। মেয়েদের এ ধরণের অপরাধে মেয়েরাই ক্ষমাহীন হয় সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া জয়ার ওপর এই পক্ষপাতটা নীলিমা হয়ত ভিতরে ভিতরে তেমন ভালোর চোখে দেখে না। যত ভালো মেয়েই হোক যত শান্ত নম্র স্বভাবই হোক না কেন অন্য কোন মেয়ের ওপর স্বামীর সামান্য সহানুভূতি, তার সঙ্গে সহজ ভাবে মেলামেশা কেউ পছন্দ করে না। নির্মল মনে মনে হাসল। যে যাই ভাবুক, জয়ার সম্বন্ধে তার কোন দুর্বলতাই নেই। সে শুধু চায় মুহূর্তের ভুলকে চিরস্থায়ী না ক'রে তুলে জয়া স্বামীর ঘরে ফিরে আসুক। ফের আবার দশের কাজে লাগুক; দেশের সমাজের উপকার হোক।

স্ত্রীর কাছে কোন সাড়া না পেয়ে তার সাহায্য আর চাইল না নির্মল। মনে মনে নিজেই একটা মতলব ঠিক করল। একখানা এনভেলপে সংক্ষেপে একটা চিঠি লিখল জয়াকে, 'তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার, অবশ্য এসো।' অমিয়র অফিসে ফোন ক'রে তার এক সহকর্মীকে ঠিক একই কথা জানিয়ে রাখল নির্মল। বুধবার বেলা তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে নির্মলের ডিসপেনসারিতে অমিয় যেন একবার অবশ্যই

আসে। নির্মলের বিশেষ দরকার আছে। জয়াকেও ঠিক ওই একই সময়ের কথা জানিয়েছিল নির্মল। তার ধারণা দূরে থাকায় পরস্পরের ওপর ওদের বিদ্বেষ আরো বেড়ে যাচ্ছে। দুজনের দেখা সাক্ষাৎ কথা-বার্তা হলে ওদের মনের গতি বদলাতেও পারে। দু'পক্ষকে মুখোমুখি আনতে পারলে সালিশীতেও সুবিধা হবে নির্মলের।

দুপুরের এই সময়টায় ডিসপেনসারি বন্ধ থাকে নির্মলের। কম্পাউণ্ডার বিনোদকে দূরে অন্য একটা কাজে পাঠিয়ে নির্মল জয়া আর অমিয়র জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না। জয়া ঠিক সময়েই এসে উপস্থিত হোল। আর অমিয় তার মিনিট পাঁচেক পরে।

কাঠের পার্টিসন ঘেরা ছোট্ট কামরাটিতে তাদের একেবারে মুখোমুখি বসবার ব্যবস্থা করেছে নির্মল।

অমিয় আর জয়া মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। যেন প্রাণহীন, স্পন্দনহীন সাদা আর কালো দু'টি পাথরের মূর্তি পরস্পরের দিক তাকিয়ে রয়েছে। যুগের পর যুগ কেটে যাবে তবু তাদের চোখে কোনদিন পলক পড়বেনা।

জয়ার পরণে খয়েরী রঙের একখানা তাঁতের শাড়ি। হাতে দুগাছি ক'রে প্লাস্টিকের চুড়ি ছাড়া আর কোন আভরণ নেই। দীনতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে জয়া। সে দৈন্য সে গোপন করতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি। কিন্তু পরিচ্ছদের দীনতাকে ছাপিয়ে উঠেছে ওর দেহের স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য। ভূষণ যেমন ওকে মানায়, এই ভূষণহীনতাও ওকে তেমনি মানিয়ে গেছে। ওর শাড়ি পরবার চুল বাঁধবার ধরণ ওর বসবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যেন ওর সুষমা বৃদ্ধি করেছে।

এক দুঃসহ ঈর্ষায় বুকের মধ্যে যেন জ্বলে গেল অমিয়র। সেকি আশা করেছিল জয়ার অন্যায় অবৈধ আচরণ ওর রূপকে বিকৃত দেহকে

কদাকার ক'রে তুলবে ? জাত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সব যাবে ? কিন্তু তাতো যায়নি। মনোতোষের ঘরে গিয়েও ওর স্বাস্থ্য আর লাবণ্য অটুট আছে। তাহলে খুব সুখেই আছে জয়া। নিজের স্ত্রীর দেহে আর একজন পুরুষের স্থূল উপভোগের চিহ্ন যেন এবার চাক্ষুষ দেখতে পেল অমিয়। আর হঠাৎ তার মন এক দুঃসহ ঘৃণা আর বিদ্বেষবোধে পূর্ণ হয়ে উঠল।

অমিয়র ইচ্ছা হোল হিংস্র শ্বাপদের মত এই স্খলিতা নারীটির ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ওকে ছিঁড়ে ফেলে, ওর অস্তিত্ব একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়।

সেই দৃষ্টির সামনে লজ্জায় ভয়ে জয়া যেন কাঠ হয়ে রইল। অমিয় কি তাকে অপমান করবে ? কি হবে সে অপমানের ধরণ ? আশঙ্কায় বুক কাঁপতে লাগল জয়ার। একটুবাদে নির্মলের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমি এবার যাই।'

জয়ার গলার স্বরে অমিয়র চমক ভাঙল। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে এল তার। নিজের মানসিক অবস্থার কথা ভেবে একটু যেন লজ্জাও বোধ করল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল নির্মলের ওপর। কিন্তু রাগ চেপে বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বলল, 'তোমার কৌতুকবোধকে ধন্যবাদ নির্মল!' তার সেই স্বল্প হাসি ভারি বিরূপ ভারি বিসদৃশ দেখাল।

নির্মল একটু কৈফিয়তের সুরে বলল, 'কৌতুকবোধ! এ সব তুমি কি বলছ অমিয়। আমি তোমাদের ভালোর জন্যেই—'

অমিয় বলল, 'থাক, থাক। যথেষ্ট ভালো তুমি করেছ আর বেশি হিতৈষণার দরকার নেই।'

নির্মল একটুকাল চুপ ক'রে থেকে শান্তভাবে বলল, 'কিন্তু তুমি যা করতে যাচ্ছ তা জয়াকে জানিয়ে দেওয়ার দরকার আছে।'

অমিয় বলল, 'উকিলের কাছ থেকেই জয়া তা সময়মত জানতে

পারত, তার জন্যে তোমার ছল-চাতুরির দরকার ছিল না। বেশ জানানো দরকার জানাচ্ছি।'

তারপর জয়ার দিকে ফিরে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'আমি ডিভোর্স স্যুট করব ঠিক করেছি জয়া।'

মনে হোল জয়া যেন একটু চমকে উঠল, আস্তে আস্তে বলল, 'ডিভোর্স!'

অমিয় বলল, 'হ্যাঁ। যে বিচ্ছেদটা এখন বে-আইনী, তাকে আইন-সম্মত করে নিতে চাই। আশা করি তাতে তোমার আপত্তি নেই।' কথার সুরে ঠোঁটের হাসিতে ধারালো ব্যঙ্গ ঝিলিক দিয়ে উঠল অমিয়র।

এতক্ষণে সোজা শক্ত হয়ে বসল জয়া। অমিয় কি তাকে ভয় দেখাতে চায়! স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল জয়া।'

মৃদু কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল, 'না, কোন আপত্তি নেই।'

খানিকক্ষণ তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল। যেন আর কারো কোন কথা বলবার নেই। সব কথা শেষ হয়ে গেছে।

একটুবাদে নির্মল ফের আবার অনুরোধ শুরু করল, 'তোমরা এখনো ভালো ক'রে ভেবে দেখ, ঝোঁকের মাথায় সাময়িক উত্তেজনায়—' কিন্তু সালিশী জমল না।

'কাজ আছে' বলে অমিয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একটুকাল চুপ করে থেকে জয়া বলল, 'আমিও এবার উঠি নির্মল। তুমি অনর্থক অপমানিত হলে। তোমার জন্যে দুঃখ হয়। আগে জানলে তোমাকে আমি নিষেধ করতাম।'

নির্মল বলল, 'আমার কথা ছেড়ে দাও। ও সব আমার গায়ে লাগে না। আমি তোমার কথা ভাবছি। তুমি চেষ্টা করলে এসব কেলেঙ্কারি থেকে নিজেকে হয়ত রক্ষা করতে পার। তুমি নিজে যদি অমিয়কে অনুরোধ কর—'

জয়া উদ্ধত দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'অনুরোধ ? কক্ষণো নয়। আত্মসম্মান শুধু তোমাদের নয়, আমাদেরও আছে নির্মল। আমি একবারই লুকোচুরি করেছি, দ্বিতীয়বার করব না। আমি সকলের সামনে সব স্বীকার করব, আমি যা করেছি তার সমস্ত ফলাফল সমস্ত দণ্ড মাথা পেতে নেব। তবু কারো কাছে দয়া ভিক্ষা করব না।'

দম নেওয়ার জন্যে জয়া থামল। তারপর গলা নামিয়ে মৃদু হেসে নির্মলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কি সময় হবে ? চলনা, এগিয়ে দেবে একটু।'

নির্মল ওকে বাসা পর্যন্তই এগিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু জয়া বাধা দিয়ে বলল, 'না তার দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।'

নির্মল বুঝতে পারল জয়া খানিকক্ষণ একাই থাকতে চায়। এই মুহূর্তে অপরিচিতের ভিড় ওর সহ্য হবে, কিন্তু পরিচিত একজনের সান্নিধ্যও ওর ভালো লাগবে না।

ট্রামে বেশি ভিড় নেই। জানলার ধার ঘেঁষে একটি বেঞ্চে বসে পড়ল জয়া। রাস্তার দিকে মুখ। কিন্তু বাইরের কোন দৃশ্যই তার চোখে পড়ল না। নির্মলের ডিসপেনসারির সেই ছোট্ট কামরাটি যেন ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল।

জয়া মনে মনে ভাবল এ ভালোই হোল, এ ভালোই হোল। অমিয়র সঙ্গে যে তার দেখা হয়ে গেল, কথা হয়ে গেল, সমস্ত কথার শেষ হয়ে গেল, এতে ভালোই হোল। এর জন্যে নির্মলের কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কত লজ্জা, কত দ্বিধা, কত ভয়ই না ভিতরে ভিতরে ছিল জয়ার মনে। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে যদি হঠাৎ অমিয়র সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায় কি করবে জয়া। কি ক'রে তার চোখের দিকে তাকাবে, কি কথা বলবে, কি ক'রে কথা বলবে। এখন আর কোন ভাবনা রইল না, সংকোচের কারণ রইল না, আজ থেকে সব আড়াল ঘুচে গেল।

জয়ার মনে পড়ল নির্মলের ওই ডিসপেনসারিতে আরো কতবার কত উপলক্ষে, কত বিনা উপলক্ষে তাদের দেখা হয়েছে। হঠাৎ দেখা হওয়া নয়, দেখা যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করেছে নিজেরা। ওষুধের গন্ধে ভরা নির্মলের এই ডিসপেনসারি তাদের গোপন মিলনের স্থান ছিল এক সময়। এখানে বসে তারা কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে। তাদের বসিয়ে রেখে রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছে নির্মল। চা কি সিগারেট আনতে দেওয়ার ছলে কম্পাউণ্ডার বিনোদকে সরিয়ে দিয়েছে অমিয়। তারপর জয়াকে আলমারির আড়ালে ডেকে নিয়ে মুখের কাছে এগিয়ে নিয়েছে মুখ।

জয়া ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি দু'পা পিছনে সরে গিয়েছে, 'ছি ছি, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই? যদি বাইরের রোগী-টোগি কেউ এসে পড়ে।'

তারপর নিজেই জয়া একদিন রোগিণী হয়ে এসেছে এখানে। প্রথম প্রথম নির্মলই তো চিকিৎসা করত তার। অমিয় তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসত। তখন অমিয়র চোখে কি উদ্বেগ, কি দুশ্চিন্তা! অত লোকের সামনে রিকসা থেকে তাকে হাত ধরে নামাত অমিয়। তার মুখে কোন কথা থাকত না। কিন্তু কি গভীর মমতাই না তার স্পর্শে তখন লেগে থাকত।

আজ সেই ডিসপেনসারিতেই সব শেষ হয়ে গেল। সেখানে বসেই অমিয়র মুখের শেষ কথা শুনতে পেল, তাকে শেষ কথা শুনিয়ে দিল জয়া। এ ভালোই হোল।

বাসায় ফিরে এসে জয়া দেখল মনোতোষ তার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ একটু তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছে মনোতোষ। জয়া ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে রূঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করল 'কোথা গিয়েছিলে? নিশ্চয়ই নির্মল ডাক্তারের ওখানে?'

জয়া একটু হাসল, 'হ্যাঁ ঠিক তাই। অনুমান করবার শক্তি তোমার আছে দেখছি।'

মনোতোষ গম্ভীর ভাবে বলল, 'দেখ সব কথাই হেসে উড়িয়ে দিয়ো না। আমি নিষেধ করা সত্বেও কেন গিয়েছিলে সেখানে?'

দোর জানালা বন্ধ করে দিয়ে এল জয়া। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'অত চেঁচিয়ো না। আমাদের সামনে মহাবিপদ।'

এবার আর পরিহাস নয় সত্যিই আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠল জয়ার মুখে জয়ার স্বরে।

মনোতোষ আরও কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'কিসের বিপদ বলো?'

জয়া বলল, 'তোমার অমিয়দা আমাদের নামে কেস করছে।'

মনোতোষ শঙ্কিত হয়ে বলল, 'কেন? কিসের কেস?'

ওর ভয় দেখে জয়ার কৌতুকবোধ ফিরে এল, 'কিসের আবার? পরের বৌকে চুরি করে নিয়ে এসেছ তার শাস্তি পেতে হবে না? তারা কি তোমাকে অমনি ছেড়ে দেবে?'

মনোতোষ জয়ার মুখের দিকে একটু কাল তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'অত ভয় দেখাচ্ছ কেন বউ? তুমি কি ভেবেছ আমি জেল জরিমানার ভয় করি? তোমার জন্যে এত কলঙ্ক মাথায় নিতে পারলাম, অমিয়দার মত উপকারী মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারলাম, আর দু'চার বছরের জন্যে জেলে যেতে পারব না! হোক জেল। কতদিন জেল হবে—পাঁচ বছর, দশ বছর? তার বেশি তো আর নয়। কিন্তু তার পরেও তো অনেকগুলি বছর আমরা পাব। তুমি যদি আমার পথের দিকে চেয়ে বসে থাকো সে জেলও আমার কাছে সুখের হবে। তোমার মুখ ভাবতে ভাবতে আমি পাঁচ বছর দশ বছর বেশ কাটিয়ে দিতে পারব।'

এই অতি উচ্ছল প্রণয় নিবেদন শুনতে শুনতে জয়ার ভারি লজ্জা

হ'তে লাগল। কিন্তু শুধু লজ্জাই যেন নয়। মনোতোষের কথায় এক ধরণের গর্বও বোধ করল জয়া। আশ্বাস পেল। সে একা নয় অমিয়র বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত আর একজন পুরুষ আছে জয়ার সঙ্গে। আর সেই সঙ্গী যত দরিদ্রই হোক যত অজ্ঞ অশিক্ষিতই হোক বিপদে আপদে সব সময় জয়ার পাশে থাকবে, প্রাণ দিয়েও তাকে সে রক্ষা করবে। কারো রক্তচক্ষুকে আর ভয় নেই জয়ার।

মনোতোষের আরো কাছে সরে এল জয়া। তাকে আশ্বাস দিয়ে স্নিগ্ধ কোমল স্বরে বলল, 'অত ভাবনা নেই তোমার। জেল-টেল কিছু হবে না। আমি সব স্বীকার করব। আমি সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলব আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে চলে এসেছি, তোমাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছি।'

মনোতোষ জয়াকে বুকে চেপে ধরে বলল, 'বলবে? সত্যই বলবে এ কথা?'

জয়া বলল, 'নিশ্চয়ই বলব। যা সত্য তা কেন বলব না।'

মনোতোষ বলল, 'তা যদি বল তাহলে আর আমার কোন দুঃখ নেই।'

জয়া বলল, 'কিন্তু দুঃখ না থাকলেও দুর্ভোগ যথেষ্ট আছে মনোতোষ। হাঙ্গাম তো কম নয় তাতে আমাদের হাতে টাকাপয়সা নেই।'

মনোতোষ বলল, 'তার জন্যে ভেব না। টাকা আমি ধার ক'রে আনব। ধার না পাই তোমার জন্যে চুরি ডাকাতি করব।'

জয়া বলল, 'ছিঃ।'

মনোতোষ লজ্জিত হয়ে বলল, 'অমনিই বললাম। তোমার মাথা নিচু হয় আমি কি সত্যিই তা করতে পারি! আমি কি জানিনে তোমার মানসম্মানের ভার এখন সব আমার হাতে? আমার বন্ধুরা কতজনে

কত কি বলছে, কত জনে কত রকম মন্তর দিচ্ছে কিন্তু আমি কারো কথায় কান দিই নে।'

জয়া বলল, 'না, কোন কুমতলব কোন কু-কাজের মধ্যে তুমি যেয়ো না।'

মনোতোষ বলল, 'কুকাজ নয় কিন্তু তোমার জন্যে ভারি শক্ত শক্ত কাজ করতে ইচ্ছে করে। এমন কাজ যা কেউ কোনদিন করে নি। দেখ, আমাদের মধ্যে পণ দিয়ে মেয়ে আনতে হয়। জীবন ভর টাকা জমিয়ে সেই টাকা দিয়ে লোকে বিয়ে করে। তবে সেই বউ বশ হয়, তবে সেই বউ ঘরে থাকে। আমারও ইচ্ছে করে আমি পণ দিই, আমি তোমার পুরো দাম দিই বউ। আমি তোমাকে অট্টালিকায় রাখি, রাজভোগ খাওয়াই, সোনা গয়না পরাই। তোমার যেমন রাজকন্যার মত রূপ তেমনি রাজকন্যার আদরে রাখি তোমাকে।'

জয়া একটুকাল চুপ ক'রে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি যদি ভালো হও, তুমি যদি মানুষ হও এই কুড়ে ঘরই আমার সুখের ঘর হবে মনোতোষ। ছাড় এবার আলো জ্বালি।'

মনোতোষ আলিঙ্গন শিথিল করল। জয়ার শেষ কথাটা ওর তেমন ভালো লাগল না। যদি ভালো হও, যদি মানুষ হও। কেন, মনোতোষ কি যথেষ্ট ভালো নয় মানুষ নয়? তার কাছে আর কি চায় জয়া? এক ঘরখানার অবস্থাই যা একটু খারাপ কিন্তু খাওয়া-দাওয়া আদর-আহ্লাদের দিক থেকে জয়াকে অমিয় যা দিত তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম দিচ্ছে না মনোতোষ। স্ত্রীলোক পুরুষের কাছে শাড়ি চাইবে, গয়না চাইবে, আদর সোহাগ চাইবে তা মনোতোষ বোঝে। কিন্তু তার হাতে পুরোপুরি ভাবে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পরও ওসব বড় বড় কথা শোনাতে চাইবে কেন জয়া, কেন তাকে উপদেশ দিতে চাইবে?

বিষয়টা যত লজ্জাকরই হোক উকিলের শরণ জয়াকেও নিতে হোল। কোন চেনা জানা উকিলের কাছে গেল না। বেলেঘাটার এক অপরিচিত প্রৌঢ় আইনজীবী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করল জয়া। তাদের উকিলের দরকার শুনে বস্তির হরলালই তাঁর ঠিকানা এনে দিল। অনন্তবাবু বললেন, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনিও আপনার স্বামীর নামে পাল্টা কেস করুন না। তাঁর বিরুদ্ধে আপনারও তো অভিযোগ থাকতে পারে। অপরাধ কি এক তরফা হয়? ধরুন, তিনি কি কোনদিন অন্য মেয়ের ওপর আসক্ত হন নি? আপনাকে কোন রকম নির্যাতন করেন নি।'

মুহূর্তের জন্যে সর্বাণীর কথা মনে পড়ল জয়ার। কিন্তু পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলল, 'না না ওসব কিছু নয়। আর কোন কেলেঙ্কারি নয়। আমাকে যেন কোর্ট পর্যন্ত যেতে না হয়, শুধু এইটুকু সাহায্যই আমি আপনার কাছে চাই। আমি সব স্বীকার করব।'

অনন্তবাবু বললেন, 'সব স্বীকার করবেন? কোন কমপ্লেনই আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে করবেন না? ভেবে দেখুন ভালো করে।'

জয়া বলল, 'দেখেছি। আপনাকে যা অনুরোধ করলাম, দয়া করে সেইটুকুই শুধু করে দিন।'

অনন্তবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আচ্ছা আপনি যেমন চান তেমনি হবে। তবে মেডিকেল সার্টিফিকেটের জন্যেও কম খরচ হবে না আপনার।'

জয়া বলল, 'তা হোক।'

পাথর বসানো দু'টি ফুল ছিল জয়ার কানে। খুলে নিয়ে মনোতোষের হাতে দিয়ে বলল, 'বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসো।'

মনোতোষ বলল, 'ও তুমি রেখে দাও বউ, টাকা আমি যেমন ক'রে পারি যোগাড় করব।'

জয়া বলল, 'কি করে যোগাড় করবে?'

মনোতোষ বলল, 'সে হয়ে যাবে একরকম করে। মামলার টাকা ভূতে যোগায় তা জান না?'

জয়া একটু হেসে বলল, 'না ভূতের ওপর নির্ভর করে দরকার নেই, ওটা বিক্রি করে দাও। গয়না পরে তো তুমিও দিতে পারবে।'

মনোতোষ বলল, 'আচ্ছা।'

সদানন্দ সামন্ত মনোতোষের সঙ্গে কাজ করে। অফিসে বেয়ারাদের সে সর্দার। বয়সেও মনোতোষের চেয়ে বছর পাঁচেক বড়। কালো বেঁটে চেহারা। ভারী চালাক চতুর। মানুষের পেটের কথা সে বের করে নেয়। মনোতোষও তার কাছে কিছু গোপন রাখতে পারেনি। কথায় কথায় সবই বলে ফেলেছে। সেই সদানন্দের কাছেই আজ সে হাত পাতল। হাত তার কাছে অনেকেই পাতে। এই সিটি ইনসিওরেন্স অফিসের অনেক কেরাণীবাবুই গোপনে গোপনে মাসের শেষে তার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে পরে স্থদ সমেত শোধ করে। দেশে সদানন্দের কিছু জায়গা জমি আছে। তাছাড়া সেবার লটারীতেও হাজার দেড়েক টাকা পেয়ে গেছে সদানন্দ। সবাই বলছে, 'এবার আর তুমি চাকরি করবে কোন্ দুঃখে। ব্যবসা কর।' সদানন্দ সবিনয়ে বলছে, 'কি যে বল তোমরা। ব্যবসা করব টাকা পাব কোথায়? চাকরি ছাড়ব খাব কি?' কেউ কেউ বলে ব্যবসা সদানন্দের আছে। তবে তা গোপন বাজারে। নিজেদের গাঁয়েরই এক চালের কারবারীর সঙ্গে আনাগোনা আছে সদানন্দের। সে অবশ্য তা স্বীকার করে না, বলে, 'তাহলে কি বেয়ারাগিরি করে মরতাম।'

অবশ্য নামেই বেয়ারাগিরি। সর্দারী আর খবরদারী ছাড়া কাজ কিছুই করে না সদানন্দ।

মনোতোষের কথা শুনে সে বলল, 'তোর আবার টাকার দরকার পড়ল কিসে?'

বলবে না বলবে না করেও মনোতোষ প্রায় সবই বলে ফেলল।

সদানন্দ বলল, 'খবরদার অমন মামলা-মোকর্দমার মধ্যে যাসনে, মরে যাবি। যথেষ্ট ভোগ সুখ করে নিয়েছিস। এবার ছেড়েদে বউটাকে। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক।'

মনোতোষ বলল, 'না সদানন্দদা, তা পারব না। ছেড়ে দিতে পারব না।'

সদানন্দ বলল, 'আরে হতভাগা, তুই না পারলে সে পারবে। সময় হলে তেমন বড়লোক, ভদ্রলোক বন্ধু-টন্ধু কেউ জুটলে তোকে কলা দেখিয়ে সরে পড়বে। এসব মেয়ে আমার চেনা আছে।'

এধরণের কথা সদানন্দ আগেও বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেছে মনোতোষ, আজও করল, বলল, 'না সদানন্দদা এ তেমন মেয়ে নয়। এর মত মেয়ে তুমি দেখনি।'

সদানন্দ বলল, 'দেখিনি তো দেখানা একদিন। কতদিন ধরেই তো তোকে বলছি। দেখলেই কি আর কেড়ে নিয়ে যাব?'

মনোতোষ জিভ কেটে বলল 'ছিঃ দাদা, তোমার বউমা হয় সম্পর্কে। এই ফ্যাসাদ থেকে আগে উদ্ধার পাই, তারপর নিশ্চয়ই একদিন নিয়ে যাব তোমাকে, মামলায় যদি জিতে যাই, তোমাকে নেমন্তন্ন করে বউয়ের হাতের রান্না খাওয়াব, সত্যি বলছি।'

পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিল মনোতোষ, কিন্তু ফুলজোড়ার বদলে তাকে তিরিশ টাকা দিল সদানন্দ। বলল, 'আর কারো কাছে গেলে তুই কুড়ি টাকাও পেতিনে। যতদিনে পাবিস শোধ করিস, তার জন্যে তাড়া নেই, সুদ তোকে একপয়সাও দিতে হবে না। কিন্তু তোর সেই সতীসাধ্বীটির সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দেওয়া চাই।'

মনোতোষ বলল, 'নিশ্চয়ই দেবো।'

শুধু কানের ফুল বিক্রির আব মনোতোষের মাইনের টাকায় কুলোল না, গোপনে গোপনে নির্মলের কাছ থেকেও কিছু ধার করতে হোল জয়াকে।

তারপর মাসখানেক বাদে সব ঝামেলা মিটল। খরচ সমেত ডিক্রী পেয়ে কোর্ট থেকে বেরিয়ে এল অমিয়, সামনেব মিষ্টির দোকানে ঢুকে খাইয়ে দিল উকিলকে। মনে পড়ল পাঁচ বছর আগে বিয়ের দিনও সাক্ষীদেব, বন্ধুদের খাইয়েছিল। সেদিন ট্যাক্সী ক'রে বাড়ি ফিরেছিল সবাইকে নিয়ে, আজ একা। কিন্তু তাই বলে ট্যাক্সীর তো অভাব নেই। কি ভেবে আজও একটা ট্যাক্সী ডাকল অমিয়। বহু দিন পবে আরাম ক'বে হেলান দিয়ে বসল সুখাসনে। এলনা জয়া। সাহস কোথায় যে আসবে। সাহস কোথায় যে তার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাবে। আড়াল থেকে চিঠিতেই যত সব বড় বড় কথা। আসলে ভীরু। একেবারে ভীরু। যদি আসত তাহ'লে মন্দ হোত না। কোর্টেব কাজ শেষ হয়ে গেলে হয়তো এই ট্যাক্সীতেই পাশাপাশি বসে দুজনে একসঙ্গে ফিবত, বিয়ের দিন যেমন ফিরেছিল। অমিয় তা খুবই পারত। কিন্তু ততখানি মনের জোর থাকলে তো জয়ার। আসলে ওর কোন জোর নেই, ও ভীরু, ও দুর্বল, একেবারে দুর্বল।

হঠাৎ অকারণে দৃঢ়চিত্ত অমিয়ব দুই চোখ ছল ছল ক'বে উঠল। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে চোখ মুছল অমিয়। ড্রাইভাব যদি কোন কারণে এদিকে মুখ ফেবায় অবাক হয়ে যাবে। ভাববে বাবুর কেউ মারা-টারা গেল নাকি। মারা তো গেলই। এতদিন পরে স্ত্রী বিয়োগ হোল অমিয়র। জয়া বেঁচে আছে, কিন্তু অমিয়র স্ত্রী আর নেই।

কোর্টের রায়ের নকল হাতে করে বস্তির ঘরে জয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ভাবল যাক বাঁচা গেল। দোটানার হাত থেকে বাঁচা গেল। একটা দিক পরিষ্কার হয়ে গেল একেবারে। এখন আর পথ স্থির করতে, কর্তব্য স্থির করতে কোন অসুবিধে হবে না, অন্যায়বোধের লজ্জায় এখন আর তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে না। এখন সে আবার বেরুতে পারবে। বন্ধুমহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে নতুন ক'রে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার কথা বস্তির অনেকেই টের পেয়েছিল। জয়া আর মনোতোষের সম্পর্ক যে স্বাভাবিক নয়, ওদের ভিতরে যে একটা গুঢ় রহস্য আছে তা প্রায় প্রথম থেকেই কারোর অজানা ছিল না। ব্যাপারটা তাদের নিত্যকার জল্পনা-কল্পনা গল্পগুজবের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সামনে কিছু না বললেও আড়ালে-আবডালে সকলেই এ নিয়ে গা টেপাটেপি চোখ টেপাটেপি করত। মামলার কথা শুনে অনেকেই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলনা, মনোতোষের জেল জরিমানা কিছুই হোলনা দেখে অনেকেই নিরাশ হোল। জয়ার জবান-বন্দীতেই যে মনোতোষ রক্ষা পেয়েছে একথাও কানে গেল তাদের।

পুরুষেরা বলল, 'যাই বল, মেয়েটার সাহস আছে।'

মেয়েরা বলল, 'ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। যে সোয়ামী পুত্তুর ত্যাগ করে আসতে পারে তার আবার ভয় কিসের।'

কেউ কেউ বলল বস্তির মধ্যে এদের থাকতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে অনাচার কদাচার আরো বাড়বে। দু'জনকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে। আগু বাড়িয়ে কে যাবে হাঙ্গামা করতে, তাছাড়া স্বয়ং হরলাল ওদের পক্ষে। তার প্রভাব প্রতিপত্তিই এখানে সব চেয়ে বেশি। বাড়িওয়ালা তার হাতের মুঠোয়। আরো একটা কারণে জয়াদের তুলে দিতে অনেকেই

রাজী হোল না। যে যাই বলুক জয়ার আচার ব্যবহারে কোন বেচাল নেই। কারো সঙ্গে কোন বাদ-বিসম্বাদ ঝগড়া-ঝাঁটি করতে যায়না জয়া। বরং সাধ্যমত সকলের উপকারই করে। আনাজ তরকারি থেকে শুরু করে তেল লবণ কয়লা কেউ ধার চাইলে জয়া না করে না। ধার শোধ দেওয়ার জন্যে তাগিদ দেয় না। বস্তির পুরুষদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে। ঘোমটা টেনে বউ হয়ে থাকে না বটে, কিন্তু তার কথায় বার্তায় হাসিতে কারো কোন রকম আপত্তি করবার জো থাকে না। বরং চোখ জুড়োয় মন খুসি হয়। সাধ হয় এরকম একটি বউকে নিজের ঘরে পেতে।

বস্তির ছেলে মেয়েগুলিও জয়ার ভারি ভক্ত হয়ে উঠেছে। সারাটা দিন তারা গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত চেঁচামেচি মারামারি করত। সেইসব ডানপিটে ছেলেমেয়েদেব যে এক জায়গায় এনে বিনা খরচে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করেছে জয়া এও তো কম বাহাদুরী নয়।

জয়াদের বিরুদ্ধে বিরূপ সমালোচনা হলেও একেবারে ওদের তুলে দেওয়ার প্রস্তাবে কেউ সায় দিল না।

দিন কয়েক চুপচাপ থাকবার পর জয়া আবার তার পাঠশালার কাজে লাগল। এতে ওদেরও উপকার হয় নিজের সময়টাও ভালো কাটে। অনেক দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ছেলেমেয়েরা একে একে সবাই এল পাঠশালায়। এলনা কুঞ্জ দাসের মেয়ে ময়না। বছর পাঁচেক বয়স হয়েছে মেয়েটির। ভারি চালাক চতুর। ওকে দেখলেই মঞ্জুর কথা মনে পড়ে জয়ার। মঞ্জুর মুখের সঙ্গে খানিকটা আদল আছে। চোখ দুটি অবিকল এক রকম। ময়নার ওপর ভারি পক্ষপাতিত্ব আছে জয়ার। কেউ যদি কাছে না থাকে ওকে বুকে টেনে নেয় জয়া কপালে গালে চুমু খেয়ে আদর করে। ঘরে কোন

ফলটল থাকলে এনে দেয়। গোপনে গোপনে দু'একটা পয়সা দেয় লজেন্স কিনে খাবার।

কদিন ধরে মঞ্জুর কথা মনে পড়ছে জয়ার। শিশু সন্তানের ওপর তার স্বত্ব কোর্ট স্বীকার করেছে। অনেকবার ভেবেছে এবার থেকে মঞ্জুকে নিজের কাছে এনেই রাখবে জয়া। আবার ভেবেছে কি হবে এনে। এই অস্বাস্থ্যকর বস্তির মধ্যে মেয়েকে কি সে মনের মত ক'রে মানুষ করতে পারবে? ব্যাপারটা মনোতোষও হয়ত পছন্দ করবে না, বস্তির মধ্যেও নানা রকম কথা উঠবে। তার চেয়ে জয়ার মার কাছে এখন যেমন আছে তেমনই থাক। আরও কিছুটা বয়স হলে ওকে ভালো কোন বোর্ডিং হাউসে রেখে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করবে জয়া। খরচের জন্যে অমিয়র কাছে হাত পাতবে না। নিজের রোজগারেই চালাবে। এর মধ্যে কি ভালো একটা চাকরিবাকরি জয়া জুটিয়ে নিতে পারবেনা! নিশ্চয়ই পারবে। মঞ্জু তার। মঞ্জুকে জয়া কিছুতেই পর হতে দেবে না। কিন্তু বড় হয়ে সব যখন শুনবে সব যখন বুঝবে মঞ্জু কি তখন তাকে ক্ষমা করবে? নিশ্চয়ই করবে। মার ওপর সহানুভূতি একদিন তার জাগবেই।

মঞ্জুর কথা ভাবতে ভাবতেই কুঞ্জদের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোল জয়া।

ঘরে আলো নেই। সাড়া পেয়ে কুঞ্জর স্ত্রী সরলা এগিয়ে এল।

জয়া বলল, 'কুঞ্জবাবু কোথায়?'

সরলা রুক্ষ স্বরে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কি জানি কোন চুলোয় গেছে। কেন তার কাছে কি দরকার আপনার?'

জয়া মৃদু হেসে বলল, 'তাঁর কাছে নয়, দরকার আপনার কাছেই। মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন না কেন? পড়াশুনোয় বেশ তো এগোচ্ছিল।'

সরলা বলল, 'থাক, ওসব কথা আর বলবেন না। লেখাপড়ার

বাবুগিরি আপনাদের মত বড়লোকদেরই মানায়। যার ঘরে দু'দিন ধরে হাঁড়ি চড়েনা তার মেয়ের আবার পড়াশুনা !'

শীর্ণ রুক্ষ চেহারা সরলার। পরনে ময়লা গিঁট দেওয়া শাড়ি ; গলার স্বর কর্কশ।

জয়ার মনে পড়ল ন্যাশনাল ফ্যাক্টরী থেকে কুঞ্জর চাকরি যাওয়ার কথা মাসখানেক আগে শুনেছিল। নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এদের আর কোন খোঁজ খবর নিতে পারেনি। তাছাড়া এখানকার লোকের চাকরি কখন যে থাকে আর যে কখন থাকে না তা সব সময় টের পাওয়া শক্ত।

জয়া বলল, 'কুঞ্জবাবুর এখনো কি কাজকর্মের কোন সুবিধে হয়নি ?'

সরলা বলল, 'না। আর সুবিধে হবে আমি মরলে।'

জয়া একটুকাল স্তব্ধ থেকে বলল, 'ময়না কোথায় ?'

সরলা বলল, 'এতক্ষণ খাব খাব ক'রে কাঁদছিল। এবার মার খেয়ে ঘুমিয়েছে।'

জয়া বলল, 'ছি আমাকে কেন বললেন না।'

সরলা বলল, 'কত আর বলব আপনাকে। আপনি তো প্রায়ই এটা ওটা দিচ্ছেন। তাছাড়া বলতে গিয়ে দেখি আপনি পড়াতে বসেছেন।'

জয়া আর কিছু না বলে সরলার ঘরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে আবছা আবছা অন্ধকার। মেঝেয় একটা মাদুরের ওপর ময়না উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। রোগা ঘুমন্ত মেয়েটাকে কোলে তুলে নিল জয়া। সরলাকে বলল, 'ও আজ মাসীর সঙ্গে খাবে।'

আদর পেয়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে লেগে রইল ময়না। জয়ার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। মনে মনে বলল, 'এ আমার মঞ্জু, এ আমার মঞ্জু।'

দোরের সামনে দেখা হোল মনোতোষের সঙ্গে। এইমাত্র অফিস থেকে ফিরেছে। জয়াকে দেখে বলল, 'ও আবার কাকে নিয়ে এলে?'

জয়া বলল, 'ও ঘরের ময়নাকে।'

মনোতোষ বলল, 'ঈস, একেবারে জননী জগদ্ধাত্রী হয়ে উঠলে যে।'

জয়া একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সারাদিন কিছু খায়নি। দেখছ ত কি রকম পেটে পিঠে লেগে গেছে?'

মনোতোষ বলল, 'হুঁ, লেগে ওরকম অনেকেরই যায়।'

তারপর ঘরে গিয়ে জামা খুলতে খুলতে বলল, 'শোন বউ, একটা কথা বলি। তুমি বরং তোমার মঞ্জুকেই এখানে নিয়ে এসো। তোমার সেই একটা মেয়ের বাপ কষ্টে সৃষ্টে হতে পারব, কিন্তু এই বস্তিশুদ্ধ একপাল ছেলেমেয়ের বাপ হই এমন সাধ্য আমার নেই।'

জয়া মনোতোষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ছিঃ!'

ঘুমন্ত ময়নাকে জাগিয়ে তুলে সস্নেহে নিজের হাতে তাকে ভাত খাইয়ে দিল জয়া। একবার ভাবল সরলাকেও বলে। কিন্তু সাহস পেল না। ঘরে তত চাল ডাল নেই। খানিক বাদে ময়নাকে ওর মার কাছে যখন ফিরিয়ে দিতে গেল জয়া, সরলা ওর দু'হাত জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'দিদি, কেন এত করছ তুমি আমাদের জন্যে? তুমি কি আর জন্মে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে?'

জয়া একটুকাল অভিভূত হয়ে থেকে বলল, 'আর জন্মের কেন সরলাদি, আমি তোমার এ জন্মেরও বোন। কিন্তু এমন অসহায় হয়ে পড়লে তো চলবে না দিদি। কুঞ্জবাবু যা পারেন করুন। তুমিও চেষ্টা করো যাতে দু'টো পয়সা আনতে পার।'

সরলা বলল, 'তুমি ঠাট্টা করছ দিদি। আমি কি তোমার মত লেখাপড়া জানি যে রোজগার করব?'

জয়া বলল, 'লেখাপড়া জেনেই বা আমরা কি করতে পারছি। সেকথা নয়, তুমি অন্যরকম কাজকর্মের চেষ্টাও তো করতে পারো যাতে তেমন লেখাপড়ার দরকার হয় না।'

সরলা বলল, 'কি কাজ করব? ঝিগিরি? কিন্তু আমার রোগা শরীর দেখে কেউ ঝিও রাখতে চায়না দিদি। বলে তোমার রোগ ব্যামো আছে বাছা, তুমি কাজ করতে পারবে না।'

জয়া বলল, 'ঝিগিরি কেন। ঘরে বসে যে সব কাজ চলে—ধরো ঠোঙা বানানো পান সাজা কি বিড়ি বাঁধা এর যে কোন একটা করলেও তো কিছু না কিছু আসে।'

সরলা বলল, 'আমার করতে কি অসাধ দিদি। কিন্তু উনি সে সব কথা কানেও তোলেন না। তুমি সব ব্যবস্থা ক'রে দাও আমি করব।'

জয়া বলল, 'আচ্ছা।'

এ নিয়ে কুঞ্জর সঙ্গেও সে পরদিন আলাপ করল। কুঞ্জের আপত্তি নেই, কিন্তু টাকা কই। পান আর মশলা কেনবার মত একটা পয়সাও তার হাতে নেই। জয়ার হাতও একেবারে শূন্য। এ নিয়ে মনোতোষকে বিরক্ত করতে তার ইচ্ছা হোল না। হরলালের কাছে গোপনে গিয়ে সে ধার চাইল, 'গোটা পাঁচেক টাকা দিতে হবে কাকা।'

কঞ্জুষ হরলালের কাছ থেকে কেউ একটা পয়সাও কোনদিন আদায় করতে পারে না, কিন্তু জয়া পারল। প্রত্যেক ঘর থেকে কিছু কিছু চাঁদা তুলে সরলাদের দু'দিনের খোরাকীর ব্যবস্থাও ক'রে দিল জয়া। সরলা বসল পান আর মশলার ডালা নিয়ে।

এ ধরণের কাজে শুধু সরলা নয়, অনেকেরই উৎসাহ দেখা গেল। গোপাল মিস্ত্রীর স্ত্রী শান্তি, ফটিক সার স্ত্রী যমুনা তারাও এসে ধরে পড়ল জয়াকে। তাদেরও অভাবের সংসার। তারাও নিজেরা রোজগার করতে চায়। তাদের জন্যেও একটা ব্যবস্থা ক'রে দিক জয়া।

সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা জয়া সেই কথাই ভাবতে লাগল। নতুন কাজ পেয়ে যেন নতুন জীবন পেল জয়া। বস্তির পুরুষদের সঙ্গেও এ সম্বন্ধে পরামর্শ করতে লাগল।

কিন্তু এই সময় আবার একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। সেদিন ভোরে উঠে ভারি অসুস্থ বোধ করল জয়া। মাথা ঘোরে, যা খায় তাই বমি হয়ে যায়। কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

খবর পেয়ে সরলা এল দেখতে। খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে মুচকি হেসে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। ডাক্তার কবরেজ কিছু লাগবে না। চুপ ক'রে শুয়ে থাকো দিদি, আপনিই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জয়া লজ্জিত হয়ে প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'না দিদি, তুমি যা ভাবছ তা নয়।'

কিন্তু নিজে ভিতরে ভিতরে টের পেল, ঠিক তাই। সর্বনাশ হয়েছে। মঞ্জুর বেলায়ও ঠিক এইরকম হয়েছিল দেহের অবস্থা। সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ ক'রে আসছে অবাঞ্ছিত সন্তান।

রাত্রির অন্ধকারে মনোতোষকে নিজের আশঙ্কার কথা জানাল জয়া, অস্ফুটস্বরে বলল, 'কি হবে বলতো।'

মনোতোষ উল্লসিত হয়ে জয়াকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'সত্যি? তুমি সত্যি বলছ বউ?'

জয়া বলল, 'সত্যি। সর্বনাশ কি কখনো মিথ্যে হয়?'

মনোতোষ বলল, 'সর্বনাশ কি বলছ। এতো আমার—এতো আমাদের পরম ভাগ্য।'

আবেগে আনন্দে জয়ার ঠোঁটে কয়েকবার চুম্বন করল মনোতোষ।

জয়া আস্তে আস্তে বলল, 'না মনোতোষ ভাগ্য নয়, এ আমাদের দুর্ভাগ্য।'

মনোতোষ অবাক হয়ে বলল, 'কেন, দুর্ভাগ্য কেন হতে যাবে ?'

জয়া বলল, 'দুর্ভাগ্য নয় ? নিজেরাই খেতে পাইনে। এর পরে আরো একজন এলে তাকে কি খাওয়াব ?'

মনোতোষ এবার রাগ ক'রে বলল, 'দেখ বউ, বাড়াবাড়ি করো না। বস্তির কত ছেলেকে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াও। আর আমার একটি ছেলেকে তুমি খাইয়ে পরিয়ে রাখতে পারবে না ? তুমি না পারো আমি পারব। খাওয়াবার পরাবার ভার আমার। তোমার ওপর যেটুকু ভার আছে সেটুকু তুমি ক'রে যাও।'

জয়া একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাছাড়া আরো কথা আছে। আমার শরীর তো ভালো নয়, এই তো কিছুকাল আগেও কত বড় অসুখ থেকে উঠেছি। এখন যদি ছেলেপুলে হয় তাতে আমারও ক্ষতি যে আসবে তারও ক্ষতি।'

মনোতোষ ধমক দিয়ে বলল, 'ওসব বাজে ডাক্তারী রাখো। তোমার শরীর খুব ভালো আছে। একটা কেন, দশটা ছেলে হলেও তোমার দেহের কোন ক্ষতি হবে না। দেখেছি তো আমার কাকীমাকে। তাছাড়া নিয়মিত ছেলেপুলে হলে মেয়েদের দেহ ভালো থাকে।'

জয়া আরো খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মনোতোষকে যুক্তি দেখিয়ে লাভ নেই। তবু, একটু ভাববার পর তৃতীয় যুক্তি মনে পড়ল জয়ার। খানিকটা ইতস্তত ক'রে বলল, 'শুধু তাই নয়। আরো বাধা আছে মনোতোষ। আমাদের এই সন্তানকে আইন স্বীকার করবে না, সমাজ কোন মর্যাদা দেবে না।'

মনোতোষ বলল, 'সমাজ না দেয় আমরা দেব, আমরা তাকে প্রাণভরে ভালোবাসব। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করব।'

জয়া বলল, 'শোন, পাগলামি কোরো না, এখনো বেশিদিন হয়নি। এখনো চেষ্টা করলে একটা ব্যবস্থা করা যায়।'

জয়ার কথা শেষ হতে না হ'তে মনোতোষ চীৎকার ক'রে উঠল, 'খবরদার, আমি বেঁচে থাকতে অমন পাপ কাজ তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না, কিছুতেই না।'

জয়া তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে মনোতোষের মুখ চেপে ধরল, 'আস্তে আস্তে। তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! গোঁয়ার-গোবিন্দ কোথাকার।'

মনোতোষ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর খুব ধীরে ধীরে বিষাদের সুরে বলল, 'ওসব তোমার ছল বউ, আমি সব বুঝি। আমি তোমার মনের কথা সব টের পাই।'

জয়া বলল, 'কি বলতে চাও তুমি, কি টের পাও বল?'

মনোতোষ পরম আক্ষেপের সঙ্গে বলতে লাগল, 'সব টের পাই বউ, সব টের পাই। তোমার পড়াশুনো আছে, মাস্টারী আছে, বাইরে বন্ধু-বান্ধব আছে। এই বস্তির মধ্যেও তোমার কত ভক্ত। কিন্তু আমার তুমি ছাড়া কেউ নেই। তুমিই আমার সব। তাই তুমি আমার কাছ থেকে কিছুই লুকোতে পার না। তোমার মনের কথা আমি সব বুঝতে পারি।'

মনোতোষের বলবার ভঙ্গিতে জয়ার গা শিরশির ক'রে উঠল।

জয়া বলল, 'কি বুঝতে পার বল?'

মনোতোষ বলল, 'তুমি আমাকে আসলে ভালবাস না। ঘেন্না কর।'

জয়া বলল, 'এ তোমার ভুল ধারণা মনোতোষ।'

মনোতোষ বলল, 'ভুল নয় বউ ভুল নয়, তুমি আমাকে আর ভুলিয়ো না। আমি বিড়ি খাই বলে তোমার ঘেন্না, আমি লেখাপড়া জানিনে বলে তোমার ঘেন্না, আমি মজুরী করি বলে তোমার ঘেন্না। এত ঘেন্নার জন্যেই তুমি আমার ছেলে পেটে ধরতে চাও না বউ।'

জয়া স্তব্ধ হয়ে রইল।

মনোতোষ বলতে লাগল, 'কিন্তু তুমি যদি আমার ছেলের মা'ই না হলে তবে হলে কি।'

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ায় উত্তেজিত হয়ে উঠল মনোতোষ। 'তবে কি সদানন্দরা আমাকে যা বলে ঠাট্টা ক'রে তুমি আমাকে সত্যিই তাই বানিয়ে রাখতে চাও? ওরা বলে, বড় ঘরের কোন কোন সুন্দরী মেয়ের নাকি শখের দারোয়ান আছে, কোচম্যান আছে। আমিও কি তোমার কাছে তাই?'

ঘৃণায় সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত হয়ে গেল জয়ার। কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থেকে অস্ফুট অনুনয়ের স্বরে বলল, 'থামো। দোহাই তোমার, চুপ করো এবার। তুমি যা বল আমি তাই করব।'

মনোতোষ বলল, 'আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, ওসব চিন্তা তুমি আর মনেও আনবে না। কথা দাও আমাকে।'

জয়া অস্ফুট স্বরে বলল, 'দিলাম।'

পরদিন অফিস ফেরৎ মনোতোষ কয়েকটা কাঁচা পেয়ারা আর শশা নিয়ে উপস্থিত।

জয়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'ও সব আবার কি।'

মনোতোষ বলল, 'খাও, এসময় খেতে হয়। এ অবস্থায় ফলটল চিবুতে ভালো লাগে। কাকা কাকীমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দিতেন। আমরা দু'একটা চাইলে তেড়ে মারতে আসতেন। কাকীমার কিন্তু মায়া ছিল! বলতেন আহাহা মার কেন, ওরাও খাক দু'একটা।'

জয়া হেসে বলল, 'দু'একটা কেন। তুমি ওর সবগুলিই নাও। তুমি খেলেই আমার হবে।'

মনোতোষ লজ্জিত হয়ে বললে, 'দূর তাই হয় নাকি।'

একটু বাদে বলল, 'সামনের মাস থেকে তোমার জন্মে দুধের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া যখন যা খেতে সাধ হয় আমাকে বলো, কোন লজ্জা কোরো না। এ সময় ইচ্ছেমত খেতে টেতে না পারলে ছেলে নাকি লোভী হয়, মুখ দিয়ে লালা ঝরে তার।'

জয়া মুখ নামিয়ে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। তুমি চুপ করো এবার।'

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বছর চারেক আগে আরো একজন ভাবী পিতা জয়াকে এমনি যত্ন করত, তার সাধ আহ্লাদের কথা জিজ্ঞাসা করত। রোজ অফিস থেকে এসে সেও—।

কিন্তু তার কথা আর কেন!

মাসখানেক বাদে জয়া বলল, 'শোন, আজ গোটা দশেকের সময় আমাকে একটু বেরোতে হবে।'

মনোতোষ বলল, 'কেন, এই শরীর নিয়ে আবার বেরিয়ে কি দরকার?'

জয়া বলল, 'শরীর আমার কদিন ধরে ভালোই আছে। ভেবেছি, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে একবার যাব। কার্ডটা রিনিউ করিয়ে আনতে হবে।'

মনোতোষ বলল. 'চাকরির চেষ্টা করছ বুঝি আবার? এই শরীরে তোমাকে আমি চাকরি করতে দিলে তো!'

জয়া বলল, 'বাঃ, চাকরি না করলে চলবে কি করে? আমরা কি এখানে এইভাবে থাকব নাকি? তাছাড়া খরচ বাড়বে না এর পরে!' বলে জয়া মুখ নামিয়ে নিল।

জয়ার সেই লজ্জাটুকু দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে মনোতোষ বলল, 'বাড়লইবা খরচ। আমি কি একা চালাতে পারব না মনে করো? আমি ভেবেছি এবার থেকে ফ্যান ফ্যাকটরীতে চাকরি নেব। ওখানে মাইনে বেশি। তাছাড়া ওভার টাইম আছে। টাকা আমি যেভাবে পারি

আনব। কিন্তু তুমি কিছুতেই এই শরীর নিয়ে চাকরীতে নামতে পারবে না।'

জয়া বলল, 'আহা, চাকরি চাইলেই তো চাকরি মিলছে না। শুধু কার্ডের তারিখটা বদলে আনব। তাতে আর কতক্ষণ লাগবে। সেই সঙ্গে টুকটাক দু'একটা দরকারী জিনিস নিয়ে আসব।'

মনোতোষ অগত্যা রাজী হয়ে বলল, 'আচ্ছা। কিন্তু রোদে রোদে বেশি যেন ঘোরাঘুরি করোনা।'

বহুদিন পরে একা একা শহরে বেরিয়েছে জয়া। অদ্ভুত লাগছে রাস্তা, লোকজন যানবাহন। যেন এক পৃথিবী থেকে আর এক পৃথিবীতে এসে পড়েছে। এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে। ট্রাম বাসে চলতে চলতে প্রতিমুহূর্তে ওর আশঙ্কা হ'তে লাগল, পাছে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। শুধু আশঙ্কা নয়, আশাও। যাক দেখা হয়ে যাক। দেখা হয়ে এই অজ্ঞাতবাসের পালা শেষ হোক জয়ার। কিন্তু কারো সঙ্গেই দেখা হোল না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে চাকরি প্রার্থী-প্রার্থিনীদের ভিড় ঠেলে কার্ডটা রিনিউ করাল জয়া। তারপর উঠল শ্যামবাজারের ট্রামে। কলেজ স্ট্রীটে নেমে একটা বইয়ের দোকান থেকে একখানা ইংরেজী রিডার, একখানা বাঙলা আর একখানা গণিতের বই কিনে নিল জয়া। কিনল খান দুই খাতা আর একটা পেন্‌সিল। তারপর ঢুকল পরিচিত একটা বড় বইয়ের দোকানে। নিজের জন্যে খান দুই বই নিল অল্প দামের মধ্যে।

একটু দূরেই দেখা যাচ্ছে টেলিফোনটা। জয়া মনে মনে ভাবল কারো সঙ্গেই তো দেখা সাক্ষাৎ হোল না। ফোনে দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করবে নাকি।

সুবেশ, সুদর্শন যুবক সেলস্‌ম্যানটির দিকে চেয়ে বলল, 'এখান থেকে একটা ফোন করতে পারি?'

স্মিত সৌজন্যে জবাব এল, 'নিশ্চয়ই।'

রিসিভারটা তুলে নেওয়ার পর নির্মলের নম্বরটাই প্রথমে মনে পড়ল জয়ার। কি ভাগ্য! সঙ্গে সঙ্গে পাওয়াও গেল নির্মলকে।

'হ্যালো,,কে?'

জয়া বলল, 'গলার স্বরে যদি চিনতে না পারো, নাম বললেও এখন আর চিনতে পারবে না।'

'কে, জয়া নাকি?'

'হ্যাঁ। তোমার স্মরণশক্তিকে ধন্যবাদ। তারপর কেমন আছ?'

'ভালো। তুমি ভালোতো?'

'হ্যাঁ, কোত্থেকে কথা বলছ। চলে এসোনা এখানে। অনেক কথা আছে।'

'না, গিয়ে আর দরকার নেই। তোমার ডিসপেনসারিটা জায়গা হিসেবে বড় অপয়া। যা বলবার বল এখান থেকেই শুনি।'

'অত কথা কি ফোনে বলা যায়?'

'অন্তত এক আধটু বল। যদি দেখি শোনবার মত, তাহলে নিশ্চয়ই ছুটতে ছুটতে তোমার ডিস্পেনসারিতে গিয়ে হাজির হব।'

'তাহলে তোমাকে নির্ঘাৎ ছুটতেই হবে। অনেক খবর আছে। এক নম্বর হোল আমাদের সেই লাইব্রেরী আর সংস্কৃতি পরিষদকে আবার নতুন করে চালু করা হচ্ছে।'

জয়া বলল, 'তোমার দু' নম্বর খবরটা কি।'

'দু নম্বর খবর হচ্ছে সামনের শনিবার জেনারেল মিটিং। তোমারও আসা চাই।'

'ঠাট্টা করছ?'

'ঠাট্টা নয় জয়া, সত্যি। আরো আশ্চর্য, অমিয়ই তোমার নাম প্রথম প্রস্তাব করে। তুমি কেন, আমরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

অমিয়র মত লোক—। এর পরেও আর মেম্বার হিসেবে তোমাকে রাখা যায় কিনা তাই নিয়ে কথা উঠেছিল দলে। কিন্তু অমিয় সকলের সব আপত্তি খণ্ডন ক'রে বলল—প্রথম স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে এমন আরো তো মেয়ে আছে আমাদের দলে, জয়ার থাকতে বাধা কি। ডিভোর্স হয়ে গেছে, তারা এখন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করছে। তার সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকতে পারে না! জয়ার মত মেয়ের সাহায্য সহযোগিতা পরিষদের অনেক কাজে আসবে।'

'তুমি আমার সঙ্গে পরিহাস করছ নির্মলা।'

'না জয়া না। আমি সত্যি বলছি। অমিয়র সেদিনকার কাণ্ড দেখে আমরা সবাই অবাক হয়ে গেছি। মনে হয় ওর একটা দারুণ পরিবর্তন এসেছে।'

'তা হবে। কিন্তু আমার তো কোন পরিবর্তন আসেনি। আমি তোমাদের পরিষদদ্বয়ের মধ্যে আর যেতে চাই না।'

'না না এসো। যা হবার হয়ে গেছে, আর লুকিয়ে থেকে লাভ কি। জীবনকে সহজভাবে নাও, ভয় পেয়ো না।'

'ভয় আমার নেই, তা তুমি জানো।'

'জানি বলেই তো এত ভরসা।'

'ডাক্তারী তেমন না শিখলেও তোষামোদিটা খুব রপ্ত করেছ। কিন্তু ভরসা করবার মত দলে মেয়ের তো অভাব নেই। তোমাদের সর্বাণীও তো আছে। এবার তাকে আর তোমার বন্ধুকে জয়েন্ট সেক্রেটারী করে দাও না বেশ মানাবে।' কথাটা বলতেই বুকের ভিতরটা যেন ধকধক করে উঠল জয়ার। মনে পড়ল অমিয় আর সে এক বছর সত্যিই জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিল।

'কিন্তু সর্বাণীকে পাচ্ছি কোথায়? সে তো মাস্টারি নিয়ে ঢাকা চলে গেছে।'

'ঢাকা ! এত জায়গা থাকতে ঢাকা কেন !'

'সেখানকার সেন্ট্রাল জেলে শুভেন্দু আছে যে, দেখাসাক্ষাৎ হবে। তার মুসলমান বন্ধুদের সাহায্যে যদি ছাড়িয়ে আনা যায় আসল উদ্দেশ্য তাই।'

'ও !' বলে আস্তে আস্তে জয়া ফোনটা রেখে দিল এবার। তাহলে সে যা ভেবেছিল তা নয়। সব ভুল। কিন্তু সবচেয়ে এই খবরটাতেই বেশি তৃপ্তি বোধ করল জয়া !

সেলসম্যান যুবকটির দিকে তাকিয়ে একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আপনাদের ফোনটা অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। কত চার্জ ?'

যুবকটি বলল, 'থাক না আপনাকে কিছু দিতে হবে না।'

জয়া বলল, 'তা কি হয়।'

একটা আধুলি রাখল কউন্টারের উপর।

যুবকটি তিন আনা ফেরৎ দিলে তা ব্যাগে রেখে নমস্কার জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল জয়া। খুসিতে তার মন ভরে উঠেছে। আবার সে নিজের বন্ধুসমাজে ফিরে যেতে পারবে। আবার তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনা হবে। নিজের কাজ দিয়ে যোগ্যতা দিয়ে ফের আবার সেই আগেকার আসন ফিরে পাবে জয়া। আনন্দ কি শুধু এই জন্তেই ? নাকি তা ছাড়াও আরো কিছু আছে ?

সত্যি এত কাণ্ডের পরও অমিয় যে তার পক্ষ নিয়ে কথা বলতে পারে এর চেয়ে বিস্ময়ের কিছু নেই। কথাটা হয়তো সত্য নয়, হয়তো সবখানিই নির্মলের কৌতুক। কিন্তু সে যে শপথ করে বলল, তা নয়, সত্যিই অমিয় তার হয়ে বলেছে। বলে থাকলেই বা এমন আশ্চর্য হবার কি আছে। দলের পুরোন সহকর্মী হিসেবে জয়ার কথা বলেছে অমিয়। এই উদারতাটুকু দেখিয়ে মহানুভব বলে নিজেকে জাহির করবার দলের মধ্যে নাম কেনবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু জয়া কারো

দয়া-দাক্ষিণ্য চায় না। কারো সুপারিশে দলের মধ্যে ফিরে যেতে চায় না জয়া। সে যেখানে আছে বেশ আছে।

অফিসের পর মনোতোষ ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, চাকরির চেষ্টাচরিত্র হোল একচোট? আর কোথাও গিয়েছিলে নাকি?'

জয়া বলল, 'না, আর আবার কোথায় যাব?'

ফোনে নির্মলের সঙ্গে যে সব আলাপ হয়েছে তার কিছুই মনোতোষকে বলল না। বরং তার জন্যে যে বই খাতা নিয়ে এসেছে সেগুলি বের ক'রে দেখাল।

'এবার থেকে রোজ সকাল সন্ধ্যায় সত্যিই তোমাকে পড়াশুনো করতে হবে।'

মনোতোষ হেসে বলল, 'আর কটা দিন সবুর করো, তারপর বাপ-বেটা একসঙ্গেই তোমার পাঠশালায় ভর্তি হব।'

পরদিন মনোতোষ অফিসে বেরিয়ে গেলে পরিষদের অফিস থেকে সত্যিই একখানা নিমন্ত্রণের চিঠি পেল জয়া; আহ্বায়ক সুশীল সেন শনিবারে সাধারণ সভা আহ্বান করেছেন। নতুন কর্ম-পরিষদ গঠন করা হবে। তাছাড়া সংগঠন সম্বন্ধেও অনেক আলোচ্য বিষয় রয়েছে।

আবার ডাক এসেছে তার নিজের সেই শিক্ষিত সভ্য সমাজ থেকে, তার কর্মক্ষেত্র থেকে। জয়া কি সাড়া দেবে, জয়া কি যাবে? কিন্তু ও সমাজকে তো জয়া চেনে। ডেকে নিয়ে তাকে তারা অপমান করবে। হয়তো মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু তাদের সেই দু'চোখের ব্যঙ্গভরা দৃষ্টি জয়া কি সহ্য করতে পারবে?

গোড়ার দিকে সহ্য তাকে করতেই হবে। এই সুযোগ তাকে কিছুতেই হারালে চলবে না। জয়ার সেই বন্ধুচক্রের যত দোষই থাকুক শিক্ষায় সংস্কৃতিতে তারা তার সব চেয়ে কাছে। কিন্তু এই বস্তির মধ্যে তার সে ধরণের বন্ধু একজনও নেই, শান্তি যমুনা সরলা

কেউ না। নানাভাবে এদের সে উপকার করে। এরাও তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু সমশ্রেণীর সেই সখ্যের সম্বন্ধ, সৌহার্দ্যের স্বাদ এখানে কোত্থেকে পাবে জয়া? সেই বন্ধু সঙ্গমের জন্যে জয়া যে তৃষিত উপবাসী হয়ে আছে।

শনিবার খেয়ে দেয়ে মনোতোষ কাজে বেরোবে, জয়া বলল, 'শোন, আজও আমার একটু বাইরে যেতে হবে।'

মনোতোষ অপ্রসন্নমুখে বলল, 'এই তো পরশু টো টো করে ঘুরে এলে। আজ আবার বাইরে বেরোন কি দরকার? আজও কি চাকরির চেষ্টা নাকি।'

জয়া বলল, 'না, আজ একটা মিটিং আছে।'

মনোতোষ বলল, 'আবার সেই মিটিং টিটিং শুরু করেছ; কিন্তু মিটিংএ যেতে তোমার লজ্জা করবে না? যদি চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়!'

জয়া বলল, 'তাতো হবেই। হবে বলেই তো যাচ্ছি। কতকাল আর এভাবে লুকিয়ে থাকব?'

মনোতোষ বলল, 'লুকিয়ে থাকবে কেন। আমার বন্ধু-বান্ধব আছে তাদের সঙ্গে মেশো, তাদের বাড়িতে যাও, কিন্তু ওই সব পুরোণ বন্ধুদের সঙ্গে তোমার আর মেলামেশা চলবে না। যাদের ছেড়ে এসেছ তাদের ছেড়েই থাকতে হবে।'

জয়া বলল, 'আজ আমার যাওয়া বিশেষ দরকার।'

মনোতোষ বলল, 'কেন বাজে কথা বলছ। এ অবস্থায় তোমার আর কোন দরকার থাকতে পারে না। খাও দাও ঘুমোও, ছোট ছোট কাঁথা সেলাই করো, বুঝেছ?'

বলে হেসে মনোতোষ বেরিয়ে গেল। তারপর কি মনে ক'রে আবার ফিরে এসে বলল, 'খবরদার, কোথাও যেয়ো না কিন্তু।

মনোতোষ চলে গেলে জয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ওর শাসন তাকে সারাজীবন এমনি ক'রে মেনে চলতে হবে! খাঁচায় বদ্ধ পাখীর মত তাকে এমনি করে আটকে রাখবে তাই যদি ভেবে থাকে মনোতোষ, পরম ভুল করেছে। তেমন বন্ধন, স্ত্রী হওয়ার নামে সেই চরম দাসত্ব জয়া কোনদিনই স্বীকার করবে না।

মন স্থির ক'রে ফেলল জয়া। তার বেরোবার সময় পাছে মনোতোষ বাধা দেয়, হৈ চৈ করে, তাই অনেক আগেই সে বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার সময় সরলাকে ঘরের চাবি দিয়ে গেল। মনোতোষ এলে যেন তাকে দেয়।

সরলা বলল, 'এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছ?'

জয়া বলল, 'একটু কাজে বেরোচ্ছি সরলাদি। ও এলে বলো—

সরলা বলল, 'তাতো বলবই। কিন্তু তুমি একটু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। যা একখানা কর্তা তোমার, এক মিনিট চোখের আড়াল হলে একেবারে অজ্ঞান।'

জয়া মনে মনে হাসল, কর্তা। এর পরের বারে যখন যাবে মনোতোষকে সঙ্গে নেবে। নিজের বন্ধুদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবে জয়া। আর লুকিয়ে থাকবে না, আর ওকে লুকিয়ে রাখবে না। ম্যারেজ অফিসে গিয়ে নিজেদের সম্বন্ধকে আইনসম্মত করে নেবে। তারপর মাথা উঁচু করে ফের দাঁড়াবে জীবনের মুখোমুখি।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পুব দিকে সঙ্ঘের অফিস। তেতলা বাড়িটার দিকে খানিকটা এগিয়ে আবার ফিরে এল জয়া। মনোতোষকে এড়াতে গিয়ে বড় সকাল সকাল এসে পড়েছে। ছ'টায় মিটিং, এখন সবে চারটে। এত আগে গিয়ে কি হবে। চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেল। খানিকক্ষণ কাটাল পার্কের একটা বেঞ্চে বসে। এসব. জায়গার

সঙ্গে আর একজনের স্মৃতি বড় বেশি রকম জড়িত। বিয়ের আগে, বিয়ের পরে কত বিকাল, কত সন্ধ্যা তার সঙ্গে কেটেছে। আচ্ছা, সত্যিই কি অমিয় সকলের সামনে তার কথা বলছিল? জয়ার নাম উচ্চারণ করতে তার কি লজ্জা হয়নি, ঘৃণা হয়নি? কেমন হয়েছিল তার তখনকার মুখের ভঙ্গি, গলার স্বর? জয়ার বড় দেখতে ইচ্ছা করে।

না, আর দেখে দরকার নেই জয়ার। তার সঙ্গে দেখা আর না হওয়াই ভালো। আজ যদি অমিয় এই সভায় না আসে জয়া বড় স্বস্তি পায়। আর কোনদিন সে এখানে আসবে না। ধীরে ধীরে পরিষদের দিকে এগিয়ে গেল জয়া। কয়েকটি অপরিচিত ছেলে তার আগে আগে উঠে গেল। দু'একজন ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখল। না, কেউ জয়ার চেনা নয়। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে সরে এসে পাশের একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগেও যে সাহস তার ছিল, এখন আর তা নেই। জয়ার কি মাথা খারাপ হয়েছে? যেচে সে লাঞ্ছিত অপমানিত হতে যাচ্ছে ওদের সামনে? নিশ্চয়ই নির্মল তার সঙ্গে পরিহাস করেছে। সেই পরিহাসে যোগ দিয়ে সুশীল সেনও মজা দেখেছে। জয়া না বুঝে ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছিল। সত্যি সত্যি ভিতরে গিয়ে ঢুকলে কি কেলেঙ্কারীই না হোত। সেই সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় জয়ার পা কাঁপতে লাগল। তার এগোবার শক্তি নেই, পিছিয়ে যাওয়ারও শক্তি নেই। আর সেই মুহূর্তে অমিয়র সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

অমিয় বাড়ির ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। পথের ধারে একটি মেয়েকে অমন কুণ্ঠিত দ্বিধাগ্রস্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার দিকে তাকিয়ে সেও থমকে গেল। একটুকাল অমিয়র মুখ দিয়েও কোন কথা বেরোল না।

জয়ার মুখ ম্লান, বিবর্ণ। অমিয় কি আজও তাকে অপমান করবে?

'এসো, ভিতরে এসো।'

বহুকাল আগের, বহুকালের পরিচিত বহুবার শোনা একটি কথা ফের শুনতে পেল জয়া। এই আহ্বানে কি শুধু ভদ্রতা, শুধু সৌজন্য আছে? আর কি থাকবে? আর কি আশা করে জয়া? না, আর কিছুই সে আশা করে না।

শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ করছে জয়া। মাথাটা ঘুরে উঠেছে। অনেক কষ্টে শক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল, 'আজ থাক। আর একদিন আসব।'

অমিয় তার মুখের দিকে ফের একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'আচ্ছা, তাই এসো।'

এরপর যখন জয়া চোখ তুলে তাকাল, অমিয়কে আর দেখতে পেল না।

পাশের বাড়ির সিঁড়িতে কয়েকজন লোকের পায়ের শব্দ। তাদের মধ্যে কি অমিয়ও আছে? কে জানে?

আরও একটুকাল চিন্তা করে ফিরে যাওয়াই স্থির করল জয়া। এমন দুর্বল অসুস্থ শরীর নিয়ে সভার মধ্যে গিয়ে বসা কিছুতেই সঙ্গত হবে না। সকলের সামনে জয়া কি একটা কেলেঙ্কারি ক'রে বসবে?

জয়া বাসায় পৌঁছে দেখল মনোতোষ অনেক আগেই এসেছে। অধীরভাবে পায়চারি করছে বারান্দায়। জয়াকে দেখে গর্জে উঠল, 'কোথায় গিয়েছিলে? আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলে শুনি?'

জয়া মৃদুস্বরে বলল, 'সব পরে শুনো। আমাকে একটু রেস্ট নিতে দাও, শরীর ভারি খারাপ লাগছে আমার।'

মাদুর বিছিয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল জয়া। বার দুই বমি হয়ে গেল।

হরলালের স্ত্রী নবদুর্গা কাছেই ছিল। সে-ই তাড়াতাড়ি ছুটে এল ঘরে। মাথার কাছে বসল পাখা নিয়ে। 'কি হয়েছে বউ, কি হয়েছে মনোতোষ ?'

রাগে আক্রোশে মনোতোষ তখনো কাঁপছে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'কি হয়েছে ওই রাক্ষুসীকে জিজ্ঞেস কর, খুড়ী। গিটিং-ফিটিং বাজে কথা। কুমতলব নিয়ে ও গিয়েছিল ওর সেই ডাক্তারের কাছে। কি খেয়ে এসেছে না এসেছে ওই জানে।'

নবদুর্গা বলল, 'ছিঃ ওসব কি করতে আছে বউ। ভগবান যা দিচ্ছেন তা খুসি হয়ে নাও। পাপের বোঝা আর বাড়িও না।'

জয়া বলল, 'আপনি ঘরে যান। আমার আর পরিচর্যার দরকার হবে না। আমি বেশ আছি।'

বিছানার ওপর উঠে বসল জয়া।

নবদুর্গা চলে গেলে জয়া মনোতোষের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এখনো আমাকে অবিশ্বাস করছ ? এত স্পর্ধা তোমার তুমি এখনো এমন করে অপমান করছ আমাকে ?'

মনোতোষ বলল, 'আমার কথা না শুনে চলে গেলে কেন ? তাতে আমার অপমান হয়নি ? এত কষ্টের পয়সা দিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসের দু'খানা সিনেমার টিকিট কিনে আনলাম—'

'সিনেমার টিকেট কেটেছিলে ?'

'কেটেছিলাম বইকি, বিশ্বাস না হয় এই দেখ।'

পকেট থেকে সবুজরঙের দু'খানা টিকেট বের ক'রে জয়ার হাতে দিল মনোতোষ।

জয়া টিকেট দু'খানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মনোতোষের গায়ে।

মনোতোষ জ্বলন্ত চোখে একটুকাল তাকিয়ে রইল জয়ার দিকে। তারপর একটা বিড়ি ধরিয়ে শান্ত গম্ভীর মুখে বাইরে এসে বসল।

এরপরেও সপ্তাহখানেক শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ রইল জয়ার। ভালো ক'রে মাথা খাড়া করতে পারে না। ঘরের কাজকর্ম কোন রকমে সারে, আর চুপ ক'রে শুয়ে থাকে। কিন্তু শুয়ে থাকতে জয়ার ইচ্ছা করে না। ওর ইচ্ছা হয় আবার বেরোয়, আবার চেষ্টা করে দেখে নিজেদের সেই পরিষদ অফিসে ঢুকতে পারে কিনা। সেদিনকার ব্যর্থতার জন্যে ভীরুতার জন্যে নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পায় জয়া। যেতে পারল না, ডাকে সাড়া দিতে পারল না। কি ভাবল অমিয়। জয়া নিশ্চয়ই যেত। শরীরের দুর্বলতাই তাকে পিছনে টেনে রাখল। দৌর্বল্য যে আসলে মনেরই একথা সে কিছুতেই স্বীকার ক'রতে চাইল না।

কুঞ্জকে দিয়ে নিজেদের দলের 'যুগবাণী' কাগজখানা একদিন আনিয়ে নিল জয়া। দেশী-বিদেশী নানা খবর, সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড়, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সব উল্টে গেল জয়া। এককোণে তাদের সংস্কৃতি পরিষদেরও এক টুকরো খবর আছে। পরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকে অমিয় একটি প্রবন্ধ পড়েছে। ইতিহাসের যে বইটি সে লিখতে যাচ্ছে এটি তারই সম্ভাব্য মুখবন্ধ। নিবন্ধটি খুব প্রশংসিত হয়েছে। এতদিন পরে শুধু মুখবন্ধ! জয়া মৃদু হাসল। তারপর থেকে দিনের পর দিন কাগজ উল্টে গেল জয়া। অমিয়র আর কোন খবর নেই। মুখবন্ধের পরই সব বন্ধ।

মনোতোষের একদিন চোখে পড়ল কাগজখানা, বলল, 'পয়সা খরচ ক'রে ওই কাগজ কেন নিচ্ছ।'

জয়া বলল, 'এ কাগজে সাধারণ মানুষের সত্যিকারের খবর পাওয়া যায় বলে।'

মনোতোষ বলল, 'মিথ্যে কথা। আমি জানি কেন তুমি ও কাগজ রাখ। আমি জানি ও কাগজের মধ্যে কি তুমি পাও।'

জয়া বলল, 'কি পাই বলতো ?'

মনোতোষ স্থির দৃষ্টিতে জয়ার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুষার ছোঁয়া।'

জয়া আরক্ত হয়ে প্রতিবাদ ক'রে বলল; 'বাজে কথা বলো না।'

দিন কয়েক বাদে মনোতোষ বলল, 'এরপরে তো তোমার এই অবস্থা নিয়ে লোকের মধ্যে বেরোতে পারবে না, চল এখনই কাজটা সেরে ফেলি।'

জয়া বলল, 'কিসের কাজ ?'

মনোতোষ বলল, 'কালীঘাটে গিয়ে পুরুতের কাছে মন্তরটা পড়ে আসি চল।'

জয়া বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিসের মন্ত্র ?'

মনোতোষ একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'কিসের আবার, বিয়ের ?'

একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল জয়া, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সে কথা আমিও ভেবেছি। সে তো করতেই হবে। কিন্তু আমাদের বিয়ে তো হিন্দুমতে কালীঘাটে গিয়ে হতে পারে না।'

মনোতোষ বলল, 'নিশ্চয়ই পারে। আমিও হিন্দু, তুমিও হিন্দু। আমাদের বিয়ে হিন্দুমতে হবে না, হবে কি খৃস্টান মতে ?'

জয়া বলল, 'খৃস্টান মতে নয়, সুবিধের জন্যে অনেক হিন্দুও আজকাল রেজিষ্ট্রি ক'রে বিয়ে করে। আমার শরীরটা ভালো হলে আমরাও একদিন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের কাছে গিয়ে—'

মনোতোষ বলল, 'রেখে দাও তোমার রেজিষ্ট্রার। যে বিয়েতে উকিল লাগে, মোক্তার লাগে কলমের এক খোঁচায় যে বিয়ে নাকোচ হয়ে যায় আমি তেমন ফাঁকির বিয়ে চাইনে।'

জয়া বলল, 'তবে কি চাও তুমি ?'

মনোতোষ বলল, 'আমি চাই জন্ম-জন্মান্তর তুমি আমার কাছে বাঁধা থাক। আমি চাই মন্তর পড়ে মায়ের আশীর্বাদী সিঁদুর তোমার সিঁথিতে তুলে দিতে—যাতে তুমি আর আমাকে ছেড়ে কোথাও না যেতে পার, যাতে আমাদের মিলটা চিরকালের মিল হয় আমি সেই ব্যবস্থা করে রাখতে চাই বউ।'

জয়া একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কিন্তু সেই চির-মিলনের মন্ত্র তো তোমার পুরোহিতের পুঁথিতে নেই মনোতোষ।'

মনোতোষ ব্যঙ্গ ক'রে বলল, 'না শাস্ত্রে নেই পুঁথিতে নেই, আছে তোমার উকিল মোক্তারের আইনের বইতে! যারা দিনকে রাত করে, রাতকে দিন করে তাদের কাছে!'

জয়া বলল, 'না, তাদের সেই আইনের বইতেও নেই। সে মন্ত্র আছে নিজেদের মনে। নিজেদের বিশ্বাস আর ভালোবাসার মধ্যে।'

মনোতোষ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাতো আছেই। তবু যাতে মনের জোরটা বাড়ে সেইজন্যেই পুরুতের মন্তরটা দরকার। তাছাড়া আরো একটা কথা।'

জয়া বলল, 'বল।'

মনোতোষ বলল, নিজেরা 'যা করেছি, করেছি। কিন্তু যে আসছে সে যেন পাপের মধ্যে না জন্মে বউ। সে যেন ভালো হয়, সে যেন আমাদের মত না হয়, তার যেন ধর্মে-কর্মে মতি থাকে। আমার কথা শোন, তুমি মত দাও বউ। সদানন্দের জানাশোনা পুরুত আছে কালীঘাটে। এমন বিয়ে সে অনেক দিয়েছে। টাকা পেলে সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

জয়া বলল, 'কোন দরকার নেই সে সব ব্যবস্থার। আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবেসেছি। আমাদের সন্তান প্রেমের সন্তান, পাপের সন্তান হতে যাবে কেন?'

এমন স্পষ্ট ক'রে জয়া কোনদিন তার ভালোবাসার কথা স্বীকার করেনি। কথাগুলি মনোতোষের কানে যেন মধু ছিটিয়ে দিল।

মনোতোষ বলল, 'সত্যি বলছ তুমি আমাকে ভালোবাস? সত্যি বলছ তোমার মনে আর কোন খুঁৎখুতি নেই?'

জয়া বলল, 'না, কোন খুঁৎখুতি নেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর।'

কথায় কোন জবাব দিল না মনোতোষ। নিঃশব্দে জয়াকে আরো কাছে টেনে নিল।

ক'দিন বাদে একখণ্ড অয়েল ক্লথ কিনে নিয়ে এল মনোতোষ। তারপর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এল লালরঙের ছোট্ট নেটের মশারি, আর কাগজের ফুল।

জয়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি হচ্ছে শুনি। এসব এত আগেই এনে ঘর ভরছ কেন।'

মনোতোষ মৃদু হেসে বলল, 'আর ক'মাসই বা আছে। তাছাড়া ঘর যখন সত্যিই ভরবে, তখন যদি আমার হাত খালি হয়ে যায়? বলা তো যায় না, পরের চাকরি। এক সঙ্গে যদি সব না আনতে পারি, তাই একটা একটা ক'রে গুছিয়ে রাখছি।' একটুবাদে হেসে বলল, 'আজকাল এত সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে। এমন রূপ তোমার আর কোনদিন দেখিনি।'

'আহা!' জয়া লজ্জিত হয়ে চোখ নামাল।

আজকাল আর বেরোবার কথা ভাবতে পারে না জয়া। বেরোতে ইচ্ছাও হয় না। ভারি আলস্য এসেছে ভারমন্থর দেহে। সংসারের কাজকর্ম কোনরকমে সেরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ে। প্রথমে চোখের সামনে অবশ্য বই থাকে খোলা। তারপর বই আর চোখ দুই-ই যে কখন বুজে যায়, টেরও পায় না।

সাইকেল পিওন মনোতোষ খুব মন দিয়ে অফিসের কাজ করে।

চিঠি আর বিল বিলি করতে সারা কলকাতা টহল দেয়। এবার সে নিশ্চিন্ত। জয়া এবার চিরদিনের জন্যে বাঁধা পড়েছে। আর তার নড়বার শক্তি নেই।

সদানন্দের কাছ থেকে ফুল জোড়া একদিন ছাড়িয়ে নিয়ে এল মনোতোষ।

সদানন্দ বলল, 'কিরে কেবল কথাই দিলি, নিয়ে গেলি না বাসায়, খাওয়ালি না একদিন ?'

মনোতোষ বলল, 'আর একেবারে মুখেভাতের দিন খাওয়াব দাদা, কটা দিন সবুর কর।'

সূচনাটা মাস তিনেক আগেই ধরা পড়েছিল। একটু একটু কাসি আর খুটখুটে জ্বর, কিন্তু তেমন আমল দেয়নি অমিয়। নিজের অসুখ বিসুখকে কোনদিনই সে গ্রাহ্য করে না। ওই নিয়েই অফিস করে, লেখে, পড়ে। তার ধারণা শরীরকে একটু প্রশ্রয় দিলেই সে একেবারে পেয়ে বসে। মনের চোখ রাঙানীকে দেহ সবচেয়ে বেশি ভয় করে। তখন তাকে দিয়ে কলের মত কাজ করানো যায়। কিন্তু সেদিন একটু বেশি রকম জ্বর নিয়েই অফিস থেকে ফিরে এল অমিয়। এসেই বিছানা নিল। তার অবস্থা দেখে সুধীর নীতীশ শঙ্কিত হয়ে উঠল। থার্ডইয়ারের এই দুটি ছাত্র অমিয়র বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। টুইশনের আয়ে তাদের পড়া আর খোরাকী খরচ চলে। বাসা ভাড়াটা তাদের কাছ থেকে আর নেয় না অমিয়, একাই দেয়। তার বদলে এই কৃতজ্ঞ ছাত্র দু'টি অমিয়র খাওয়া-দাওয়ার খবরদারী করে।

সুধীর বলল, 'নির্মলদাকে খবর দিই একবার।'

অমিয় বলল, 'না-না। ডাক্তার ডাকবার কিছু হয়নি। অনর্থক সে ব্যস্ত হয়ে উঠবে।'

কিন্তু অমিয়র নিষেধ সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সুধীর আর নীতীশ কলেজ ছুটির পর নির্মলকে গিয়ে খবর দিয়ে এল।

অবস্থার কথা শুনে ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হোল। বাসায় এসে রোগীর বুক আর পিঠ যথারীতি পরীক্ষার পর নির্মলের মুখের গাম্ভীর্য আরও বাড়ল। মনে পড়ল এর আগেও কয়েকদিন সে অমিয়কে বলেছে, 'তোমার চেহারা অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন। এসো তো দেখি কি হয়েছে তোমার।'

অমিয় বলেছে, 'দরকার নেই। তুমি আবার এক বিদ্‌ঘুটে রোগের নাম ক'রে দেবে, আর তার ভয়েই আধমরা হয়ে থাকব।'

নির্মল আহত হয়ে বলেছে, 'বেশ আমার ওপর তোমার বিশ্বাস না থাকে, তুমি অন্য কাউকে দেখাও।'

অমিয় হেসে বলেছে, 'অমনিই রাগ হয়ে গেল। দরকার যদি হয় তোমাকেই দেখাব নির্মল। এমন বিনা ভিজিটের ডাক্তার আমার আর কে আছে?'

নির্মল অমিয়কে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, 'আমি এই রকমই আশঙ্কা করেছিলাম। চল, কালই এক্‌স্‌রে করাবার ব্যবস্থা করছি।'

অমিয় আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু নির্মল তাকে জোর ধমক লাগাল, 'তুমি যাই ভাব না, তোমাকে আত্মহত্যা করতে আমরা দেব না অমিয়।'

অমিয় উত্তেজিত হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসে স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল, 'তোমার কথায় আমি বড়ই অপমান বোধ করছি নির্মল। জীবনে এমন কোন দুঃখ আমি পাইনি, এমন কোন ভুল আমি করিনি যার জন্য আত্মহত্যা করতে যাব। আমার অনেক কাজ বাকি আছে তা তুমি জানো?'

র‍্যাকের ওপর কতকগুলি অগোছাল পাণ্ডুলিপি বন্ধুকে আঙুল দিয়ে দেখাল অমিয়।

সেগুলির সঙ্গে অনেক ওপরে দেয়ালে টাঙানো ছোট একখানা ফোটোর দিকেও চোখ পড়ল নির্মলের। ধুলো আর মাকড়সার জাল তার আড়াল রচনা করলেও ফোটোখানি যে কার তা নির্মলের বুঝতে বাকি রইল না। জয়ার প্রথম যৌবনের এই ছবিখানা এ বাসায় শুরু থেকেই আছে। এত কাণ্ডের পরেও ওখানা সরিয়ে রাখবার কথা অমিয়র মনে হয়নি, অমিয় বলবে তার খেয়াল হয়নি।

মানুষের মন আর মুখ বুঝি এমন বিরোধী কথা বলতেই ভালোবাসে। না কি নিজের হৃদয়ের খবর সে নিজেই রাখে না।

নির্মল বলল, 'তোমাকে আঘাত দিতে আমি চাইনি অমিয়। অনেকদিন ধরে শরীরের ওপর তুমি বড়ই অত্যাচার করেছ এই আমার নালিশ। তুমি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠো তাই আমরা চাই।'

দেখা গেল এক্স্‌রের রিপোর্ট নির্মল যা আশঙ্কা করেছিল তার চেয়েও বেশি খারাপ। দু'টো লাংসেই জখম গুরুতর। স্পেশালিস্টরা বললেন অবিলম্বে হাসপাতালে নেওয়া দরকার।

নির্মল অমিয়কে অবশ্য রিপোর্ট দেখতে দিল না। কিন্তু বন্ধুর মুখ দেখেই অমিয় সব বুঝতে পারল।

'খুব ঘাবড়ে যাচ্ছ নির্মল?' অমিয় জিজ্ঞাসা করল, পরিহাসের সুরটা ভালো করে ফুটল না।

নির্মল বলল, 'না, ঘাবড়াবার কি আছে।'

অমিয় বলল, 'তুমি এবার আমাকে যত খুসি গালাগাল দাও, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু সেদিন যা বলেছিলে দয়া করে তা আর বলো না নির্মল। সত্যিই আমি ইচ্ছা ক'রে কিছু করিনি। জয়া আর শরীর দুই-ই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।'

মনে মনে ভাবল এই দুইয়ের বিশ্বাসভঙ্গের ধরণ কি এক? কারণ কি এক?

খবর পেয়ে সহকর্মী বন্ধুরা এসে দলে দলে দেখে যেতে লাগল। নীলিমা এল, সুধারাণী এসে ভরসা দিয়ে গেলেন। নির্মল একদিন বলল, 'কিছু মনে কোরোনা অমিয়, জয়াকে কি একবার খবর দেব ?'

অমিয় বলল, 'না, কখনো না।'

অমিয়কে বাসায় রেখে চিকিৎসা আর শুশ্রূষা চালানো দুঃসাধ্য। আর রোগীর শরীরের যা অবস্থা তাতে বাসায় রাখা নিরাপদও নয়।

কিন্তু হাসপাতালে দিতে চাইলেই তো আর দেওয়া যায় না। নিজের হাতে অমিয় একটি পয়সাও রাখেনি। সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে জয়ার চিকিৎসার দেনা শোধ করে বন্ধুদের কাছে ঋণমুক্ত হয়েছে। এদিকে নির্মলের হাতও শূন্য। কাঁচড়াপাড়ায়, যাদবপুরে, কলকাতার অন্যান্য হাসপাতালগুলিতেও নির্মল চেষ্টা করে দেখতে লাগল। কোথাও ফ্রী বেড খালি নেই। ওয়েটিং লিস্টে সবাই নাম রাখতে রাজী। কিন্তু যা অবস্থা তাতে অমিয় কদিন যে ওয়েট করতে পারবে বলা যায় না।

বন্ধুরা সবাই গরীব। তবু দু'চার টাকা করে প্রত্যেকেই সাধ্যমত সাহায্য করল। কিন্তু তাতে এই রাজব্যাধির রাজস্ব উঠল না।

অমিয়র নিষেধ সত্ত্বেও নির্মল গোপনে একখানা চিঠি লিখল জয়াকে। সব কথা খুলে জানাল। অর্থ সাহায্যের জন্যে নয়। নির্মলের মনে হোল যদি খারাপ কিছু ঘটে, জয়া হয়ত অনুযোগ দিতে পারে—'আমাকে একবার জানালেও না।'

কিন্তু জানিয়েও জয়ার তরফ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নির্মল বিস্মিত হোল, দুঃখিত হোল।

আরো দিন কয়েক বাদে নির্মলের মনে হোল জয়া হয়ত নিজেই ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছে। না হয় বাসা বদল করেছে। শুধু একখানা ডাকের চিঠির উপরই ভরসা ক'রে জয়ার সম্বন্ধে শেষ বিচার করবে, না গিয়ে একবার খোঁজ নেবে ভাবতে লাগল নির্মল।

অমিয়র অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল, হেমারেজ শুরু হোল। সর্বাধুনিক প্রতিষেধকেও রোগকে রোধ করা যাচ্ছে না। অমিয়র ভিতরকার প্রতিরোধের শক্তি একেবারে শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে।

মন স্থির করে ফেলল নির্মল। খবর দিতে হ'লে এখনই। এর পরে হয়ত আর সময় মিলবে না।

সেইদিনই বিকালের দিকে জয়ার খোঁজে বেরোল নির্মল। চেনা রাস্তা। আগের বারের মত বেশি ঘুরতে হোল না।

কড়া নাড়তে সরলা এসে মুখ বাড়ালো। মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে বলল, 'কাকে চান?'

নির্মল বলল, 'জয়াকে, তারা কি এখানে আছে না উঠে গেছে?'

সরলা মৃদু হেসে বলল, 'উঠে যাবেন কেন, এখানেই আছেন। ডেকে দিচ্ছি। আসুন আপনি, ভিতরে আসুন।'

সরলার ডাকে ঘুম থেকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল জয়া। দেখতে পেল খোলা দরজার বাইরে নির্মল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর বিস্মিত দৃষ্টির হেতু বুঝতে জয়ার দেরি হোল না। মুহূর্তের জন্যে সেও মাথা নিচু করল। তারপর গায়ে ভালো ক'রে আঁচল জড়িয়ে নির্মলের সামনে গিয়ে বলল, 'এসো।'

নির্মল বলল, 'তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছিলাম। আমার ধারণা ছিল খবরটা তুমি পেয়েছ। আচ্ছা, এর আগে আমার একটা চিঠি সত্যিই কি তুমি পাওনি?'

জয়া বলল, 'না, কোন চিঠিই পাইনি। এমন কি চিঠি তুমি লিখতে পার যা পেয়েও আমি অস্বীকার করব নির্মল? নিশ্চয়ই তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়?'

দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল জয়ার মুখে।

নির্মল আস্তে আস্তে বলল, 'সাংঘাতিক কিছুই!'

জয়ার অনুরোধে ঘরে ঢুকে ছোট্ট টুলটা পেতে বসল নির্মল, তারপর সব কথাই খুলে বলল।

কথা শুরু হ'তে না হতেই জয়ার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল, কথা শেষ হবার আগেই সারা মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে গেল।

জয়া বলল, 'কিছুদিন থেকে আমার এ ধরণের আশঙ্কাই হচ্ছিল।'

নির্মল কোন কথা বলল না।

জয়া একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কিন্তু এ খবর আমাকে এ সময় জানাতে এলে কেন নির্মল? এখন আর আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

নির্মল একথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'ভেবেছিলাম তুমি একবার গিয়ে দেখা করতে পার। কিন্তু এখন দেখছি তা পার না।'

জয়া বলল, 'পারিনে?'

নির্মল বলল, 'না। তোমার শরীরের এই অবস্থায় সেখানে আর না যাওয়াই ভালো। তাতে কারো পক্ষেই কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া সেখানে গিয়ে তোমার কিছু করবারও নেই জয়া। শুধু তোমার কেন আমাদের সকলের কর্তব্যই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'

অদ্ভুত একটু হাসল নির্মল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি।'

জয়া স্তব্ধ নিশ্চল হয়ে বসে রইল। নির্মলকে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার কথাও তার আর মনে হোল না।

নবদুর্গা এলো খোঁজ নিতে 'কি বউ, কেমন আছ?'

জয়া সংক্ষেপে বলল, 'ভালো।'

ভাব দেখে নবদুর্গা আর বেশি ভূমিকা বাড়াতে সাহস পেল না। চট ক'রে কাজের কথা পেড়ে বসল, 'গোটাকয়েক আলু হবে তোমার ঘরে? আবার কালই বাজার এলে দিয়ে দেব।'

জয়া আঙুল দিয়ে ছোট একটা চুবড়ি দেখিয়ে দিল, 'ওর মধ্যে আছে নিয়ে যান।'

যাওয়ার আগে আর একবার নবদুর্গা জয়ার দিকে ফিরে তাকাল, 'অমন মুখ কালো ক'রে বসে আছ কেন বউ? মন কি ভালো নেই?'

জয়া বলল, 'না কাকিমা। ভালোই আছে।'

নবদুর্গা বলল, 'হ্যাঁ মন ভালো রাখবে। এ সময় খুব আমোদে-আহ্লাদে হাসিতে-খুসিতে থাকবে। নইলে ছেলেও হবে প্যাঁচামুখো, তার চ্যাঁচানিতে পাড়ার লোক টিকতে পারবে না তা বলে দিলুম।'

মুচকি হেসে বিদায় নিল নবদুর্গা।

তা ঠিক। হাসিখুসি থাকাই তো উচিত। কিন্তু জয়া তা থাকতে পারছে না কেন? না থাকার তো কোন কারণ আর নেই। যার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তার অসুখে কি এসে যায় জয়ার? কিন্তু এ যুক্তিতে তার মন প্রবোধ মানল না। বারবার ঘুরে ফিরে অমিয়র কথাই তার মনে পড়তে লাগল। কে জানে কতদিন ধরে হয়েছে এই রোগ। হয়তো অনেকদিন আগে থেকেই এর সূত্রপাত। জয়াকে হাসপাতালে দেওয়ার পর থেকে ভাবনায় দুশ্চিন্তায় অমিয়র নাওয়া খাওয়ার কিছু ঠিক ছিল না, খাটুনির বিরাম ছিল না। কে জানে হয়তো এ রোগের শুরু তখন থেকেই, হয়তো এ রোগের মূল জয়া নিজেই।

জয়া নিজে তো জানে এ অসুখ কি সাংঘাতিক, এতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই ত্যাগ করে। ভয়ে কাছে আসতে চায় না। আত্মীয়-স্বজন অবশ্য অমিয়র কেউ নেই। বন্ধু যারা আছে তাদের অনেকেই বেকার, কেউবা স্বল্প রোজগার আর বৃহৎ পরিবার নিয়ে বিব্রত। আছে শুধু নির্মল ডাক্তার। কিন্তু সে একা কতখানি করবে, তার কতটুকুই বা সাধ্য।

জয়ার মনে পড়তে লাগল নিজের কথা। কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে

যখন রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করেছে তখনকার কথা। সপ্তাহে দু'তিন দিন ক'রে যেত অমিয়। আর সেই দিনটির জন্মে কদিন ধ'রে কি অধীর ভাবেই না জয়া প্রতীক্ষা ক'রে থাকত। অমিয়র তখনকার সেই আশ্বাসভরা সান্ত্বনাভরা মূর্তি জয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তারপর আরো একদিনের কথা মনে পড়ল জয়ার। সেই পরিষদ অফিসের সামনে অমিয়র সেই আহ্বান, 'এসো, ভিতরে এসো।' মনের দুর্বলতায়, লজ্জায়, ভয়ে সেদিন তার ডাকে সাড়া দিতে পারেনি জয়া। কিন্তু আজও কি পারবে না? অমিয়র সেদিনকার কণ্ঠ ছিল অস্ফুট, মৃদু। আজ হয়তো সেই ক্ষীণ শব্দটুকু বের করবার শক্তিও তার নেই। কিন্তু তবু কি জয়া কিছু শুনতে পাবে না, শুনতে পাচ্ছে না? সব জেনে, সব বুঝেও কি জয়া বধির, নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে?

সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরল মনোতোষ। থলিতে ক'রে বাজার নিয়ে এসেছে। কাণিতে বাঁধা মাছ, তরকারি। নতুন পটল ওঠা সবে শুরু হয়েছে। দাম বড় বেশি। তবু নিয়ে এসেছে আধপো। জয়াকে ডেকে বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলল মনোতোষ, 'তুলে রাখ বউ।'

পকেট থেকে কাগজের একটা মোড়ক বের করে হেসে বলল, 'বল তো কি?'

জয়া বলল, 'কি জানি।'

মনোতোষ মৃদু হেসে বলল, 'একটু আমসত্ত্ব। নিয়ে এলাম বৈঠক-খানা বাজার থেকে। মুখে রুচি নেই বলেছিলে সেদিন। ভিজিয়ে ভিজিয়ে ক'দিন খেয়ে দেখতো।'

কিন্তু কোন উৎসাহ নেই, কোন স্ফূর্তি নেই জয়ার মনে। মনোতোষ এবার একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোমার? মুখে অমন খিল এঁটে রেখেছ কেন?'

জয়া বলল, 'নির্মল এসেছিল।'

মনোতোষ বলল, 'বুঝেছি। সেই নির্মল ডাক্তার কি আজও তোমার পিছু ছাড়তে পারল না? এখনো কোন লোভে সে আসে এখানে।'

জয়া বলল, 'বাজে বোকো না। তোমার অমিয়দার শক্ত অসুখ, থাইসিস্।'

মনোতোষের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'সে তো আমি আগেই জানি।'

জয়া স্থির দৃষ্টিতে মনোতোষের দিকে তাকাল, 'জানো? কি ক'রে জানলে? জানোতো, আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাওনি কেন? ও, তুমিই তাহলে আমার সেই চিঠি চেপে রেখেছিলে? কেন দাওনি আমাকে সে চিঠি? আমার চিঠি গোপন করবার কোন্ অধিকার তোমার আছে?'

অধিকার কথাটায় মনোতোষের মেজাজ বিগড়ে গেল, চেঁচিয়ে বলল, 'তুমি আমার খাবে, আমার পরবে আর বাইরের একজন পরপুরুষের সঙ্গে প্রেমপত্তর লেখালেখি করবে তা আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। অমন বেহায়াপনা আমার এখানে থেকে চলবে না।'

জয়া মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। সে চিঠি প্রেমপত্র নয়, তা তুমি নিজেও জানো। তাতে অমির অসুখের খবর ছিল।'

মনোতোষ বলল, 'ছিল তো কি হয়েছে। তার অসুখ তো তুমি কি করবে?'

ইচ্ছা করেই মনোতোষ চিঠিটা দেয়নি। তার মনে হয়েছে জয়া এ খবরে অনর্থক ব্যস্ত হয়ে উঠবে। দুঃখ পাবে। এই অবস্থায় সব রকম শোক দুঃখের হাত থেকে জয়াকে দূরে রাখতে চেয়েছে মনোতোষ। আর সেই জয়াই কিনা এই নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করছে! সারা বস্তির লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে অপমান করছে! চিঠিটা পড়ে

মনোতোষ পুরো দুদিন চিন্তা করেছে। এ খবর জয়াকে জানানো যায় কি যায় না। তারপর ভেবে স্থির করেছে জানিয়ে কোন লাভ নেই, যা ঘটেছে তাতে জয়াও যেতে পারবে না, মনোতোষও যেতে পারবে না। তাদের এমন কোন অর্থসঙ্গতি নেই যাতে অমিয়কে দূর থেকে তারা সাহায্য করতে পারে। এ অবস্থায় যেটুকু সম্ভব তার পক্ষে সেটুকু করেছে মনোতোষ। দু' দু'দিন অমিয়কে ফল কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে। দেওয়ার সময় নিজের নাম গোপন রেখেছে মনোতোষ। কারণ তাদের নাম শুনলে রাগ আর দুঃখ অমিয়র বেড়েই যাবে। নিশ্চয়ই তাদের দেওয়া ফলটল কিছুই নেবে না। শুধু তাই নয়, কালীঘাটে পুজো মানত করেছে অমিয়র কল্যাণে। সে সুস্থ হয়ে উঠলে 'জোড় পাঁঠা' দেবে। আর কি করতে পারে মনোতোষ। জয়ারই বা আর কি করবার আছে ?

মনোতোষের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে জয়া বলল, 'আমি আজ রাত্রেই সেখানে যাব।'

মনোতোষ অবাক হয়ে বলল, 'তুমি গিয়ে কি করবে সেখানে ?'

জয়া বলল, 'কি করব সেখানে গিয়ে বুঝতে পারব। শুনেছি নার্স-টার্স রাখার তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি। যেটুকু জানি, শুশ্রূষা করতে পারব।'

মনোতোষ বলল, 'অসম্ভব। তোমার কিছুতেই সেখানে যাওয়া হ'তে পারে না।' তারপর একটু গলা নামিয়ে বলল, 'এখন তোমাকে দেখলে তার অসুখ আরো বাড়বে।'

জয়া বলল, 'সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

মনোতোষ চটে উঠে বলল, 'আলবৎ ভাবতে হবে। আমাকে সব ভাবনাই ভাবতে হবে। এত রাত্রে এই অবস্থায় একটা থাইসিসের রোগীর কাছে আমি তোমাকে যেতে দিতে পারিনে।'

জয়া দৃঢ়স্বরে বলল, 'কিন্তু আমাকে আজ যেতেই হবে মনোতোষ।'

'যেতেই হবে? আমি নিষেধ করছি, তবু যেতেই হবে?'

মনোতোষ শক্ত ক'রে ওর হাত ধরল, 'দেখি, কি ক'রে তুমি যাও।'

জয়া বলল, 'হাত ছেড়ে দাও মনোতোষ, আমাকে এক্ষুণি বেরুতে হবে। স্বার্থপর পশু কোথাকার, হাত ছেড়ে দাও আমার।'

মনোতোষের আর সহ্য হোল না। হাত ছেড়ে দিয়ে ঠাস ঠাস ক'রে তিন চারটি চড় মারল জয়ার গালে।

'আমি স্বার্থপর? আমি পশু? হারামজাদী মাগী! এত বড় স্পর্ধা হয়েছে তোর?'

আশে পাশের লোকজন দরজায় ভীড় ক'রে দাঁড়াল। স্ত্রীকে মারপিট বস্তির ঘরে ঘরে প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কেউ গ্রাহ্যও করে না, দেখতেও আসে না। কিন্তু জয়ার ঘরে এ ব্যাপার এই প্রথম।

মনোতোষ ফের হাত তুলতে যাচ্ছিল, জয়া দোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন আপনারা? লজ্জা হচ্ছে না আপনাদের?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পাঁচ ছ'জন পুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়ল মনোতোষের ওপর। জয়ার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে এনে তার দু'হাত শক্ত ক'রে ধরল।

নিজের রোগা বউটাকে যে প্রায় রোজ মারে, সেই লক্ষ্মীকান্ত সব চেয়ে আগে, সব চেয়ে জোর গলায় ধমক দিল, 'এই শুয়োর, মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলছিস, লজ্জা করে না তোর? ভদ্দর লোকের বাড়ির মধ্যে কি হচ্ছে এসব?'

খাঁচায় বন্দী অসহায় বাঘের মত গর্জাতে লাগল মনোতোষ, 'তোমরা ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। হারামজাদী মাগীকে আমি

একবার দেখে নিই। ও আবার আমার ওপর লোক লেলিয়ে দেয়, এত বড় সাহস ওর।'

জয়া আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

মনোতোষ গর্জন ক'রে উঠল, 'এই হারামজাদী, আমার ছেলে পেটে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস তুই ?'

জয়ার দু'টো গাল জ্বলে যাচ্ছিল, জ্বলে যাচ্ছিল সর্বাঙ্গ, তবু সে প্রায় নিরুত্তেজ শান্তস্বরে বলল, 'তোমার সন্তান আমার পেটে। তাই পশুর মত তুমি আমাকে আজ মেরেছ। যেখানেই যাই, তোমাকে কোন কৈফিয়ৎ আমি দেব না। কৈফিয়ৎ চাইবার কোন অধিকার তোমার আর নেই।'

জয়া পা বাড়াল।

মনোতোষ ফের চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমরা ধরো সবাই, ধরো ওকে। ও আমাকে মারবার জন্যে সঙ্গে এসেছিল, পারেনি, এবার আমার ছেলেকে মেরে ফেলবার জন্যে চলেছে।'

একথা সত্ত্বেও জয়াকে ধরবার জন্যে কেউ এগুতে সাহস পেল না।

জয়া উঠানে নামল।

হরলাল এগিয়ে এল সামনে, 'সোয়ামীস্ত্রীতে ঝগড়াঝাঁটি তো হয়ই। তাই বলে এত রাত্রে কি বউ মানুষ হয়ে বাড়ির বাইরে যেতে আছে মা ? লোকে নিন্দে করবে যে।'

জয়া বলল, 'আমার একজন আত্মীয়ের ভয়ানক অসুখ, মরণাপন্ন অবস্থা। দেখবার কেউ নেই। সেখানে আমাকে যেতেই হবে।'

তারপর কুঞ্জ আর লক্ষ্মীকান্তের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দয়া ক'রে কিছুক্ষণ ওকে আটকে রাখুন আপনারা। আমাকে একবার সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে দিন।'

জয়া সদরের দিকে এগিয়ে গেল।

হাত ছাড়া না পেলেও ঠেলাঠেলি ক'রে কোন রকমে ঘর থেকে এসে বারান্দায় নামল মনোতোষ, তারপর সদরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই চললে বউ! এত দিনের এত ভালোবাসা এত আদর সোহাগ একদিনে সব ভেসে গেল? এত দিনের এত বড় সম্পর্ক এইটুকুতেই ভেঙে গেল একেবারে?'

মনোতোষের গলা ধরে গেছে। এতক্ষণের জ্বলন্ত চোখ দুটি ভরে গেছে জলে।

জয়া একবার ফিরে তাকাল ওর দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তাই যায় মনোতোষ। গড়তে অনেকদিন সময় লাগে। ভাঙতে একদিনই যথেষ্ট! তা কি তুমি নিজেই জানো না?' তার পর একটু থেমে বলল, 'ছেলের জন্যে ভেব না। সময় হোক তোমার ছেলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

'আর তুমি, তুমি আর আসবে না?'

জয়া বলল, 'সে কথা বলবার মত আমার মনের অবস্থা এখন নয়, সে কথা তোমাকে পরে জানাব।'

জয়া সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

শিয়ালদয় এসে বাস থেকে নেমে দেখে ব্যাগে আর একটি পয়সাও নেই। হেঁটে চলল সারাটা পথ। শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই। কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হোল না। জয়া যেন এক নতুন অভিসারে যাত্রা করেছে।

অখিল মিস্ত্রী লেনের সেই পুরোণ পরিচিত বাড়ি। তবু এর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে জয়ার পা কাঁপতে লাগল, কড়া নাড়তে গিয়ে হাত কেঁপে উঠল। কিন্তু মনকে শক্ত করে ধীরে ধীরে কড়া নাড়ল জয়া। সুধীর এসে দোর খুলে দিল। এতরাত্রে একজন অপরিচিতা মহিলাকে দেখতে

পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। তারপর কাহিনীটা মনে পড়ল সুধীরের। মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি কি অমিয়দার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ?'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ। কেমন আছেন তিনি ?

সুধীর বলল, 'একই রকম। আসুন।'

সুধীর বুদ্ধিমান ছেলে। অমিয়র ঘরটা দেখিয়ে সে পাশের ঘরে গিয়ে বসল। নীতীশ কদিন আগে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

জয়া একটু ইতস্তত করল। তারপর অমিয়র বিছানার পাশে এসে বসল।

অনেকক্ষণ বাদে অমিয় চোখ মেলে তাকাল, চিনতে পেরে বিস্মিত হ'য়ে বলল, 'তুমি।'

জয়া বলল, 'হ্যাঁ।'

অমিয় আর কোন কথা বলল না। বোধ হয় কথা বলতে ওর ক্লান্তি হচ্ছে। ওর চেহারাটা একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। গাল দু'টি ভেঙে বসে গেছে ভিতরে, চোখ দু'টির অবস্থাও তাই।

ঘরখানা অগোছালো, নোংরা। এখানে ওখানে ওষুধের শিশি, ফলের খোসা, পথ্যের বাটি।

রোগীর ঘরের এ পরিবেশ জয়ার অপরিচিত নয়, নিজের ভূমিকাটাই শুধু নতুন, একেবারে অচেনা।

'কেমন আছ ?' জয়া অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করল।

অমিয় ফের চোখ মেলল, দুর্বল ভঙ্গিতে একটু হাসল, তারপর ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ভালো। বেশ ভালো আছি জয়া। শুধু নির্মলই সে কথা বিশ্বাস করে না।'

একথার পর ফের দুজনে চুপ ক'রে রইল।

তারপর অমিয় হঠাৎ বলল, 'তোমরা বিয়ে করেছ ?'

এ প্রসঙ্গ অমিয় যে এখনি তুলবে, তা জয়া আশা করেনি।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'না।'

অমিয় বলল, 'এখনো করোনি? কেন করলে না? যাতে তোমাদের সম্পর্কটা সহজ হয়, আমি তো সেইজন্যেই—সেইজন্যেই পথ পরিষ্কার ক'রে দিলাম।'

জয়া বলল, 'পথ তবু পরিষ্কার হয়নি। ওকে বিয়ে করা হয়ত আর সম্ভব হবে না।'

'সম্ভব হবে না? কিন্তু—'

অমিয় এবার জয়ার দিকে তাকালো। জয়া ইঙ্গিত বুঝে একটু কাল লজ্জিত হয়ে রইল তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'কিন্তুর কথা এখন থাক। সে আলোচনা পরে হবে। আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ।'

অমিয় বলল, 'সুস্থ? সুস্থ বোধ হয় আর হতে পারব না জয়া।'

জয়া বলল, 'কিন্তু তোমাকে সেরে উঠতেই হবে। সুস্থ হয়ে বাঁচতে হবে তোমাকে। তোমার এখনো অনেক কাজ বাকি।'

অমিয় একটু হাসল, 'একথাগুলি যেন অনেককাল আগে কোথায় শুনেছি।'

জয়া বলল, 'শোননি, বলেছ। আমাকে শুনিয়েছ। আমি সেই শোনা কথাই বলছি। তোমার কথাই শোনাচ্ছি তোমাকে। আমি তখন বলতুম, তোমার জন্যে আমি বেঁচে উঠব। আমার জন্যে তুমি বেঁচে ওঠো আজ একথা বলবার মুখ আমার নেই। তুমি সকলের জন্যে বাঁচো, তুমি সকলের জন্যে বেঁচে ওঠো অমিয়।'

এতক্ষণে চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠল জয়ার, গলা ধ'রে গেল।

কোন কথা না বলে নিজের শীর্ণ হাতের মধ্যে জয়ার হাতখানা অমিয় তুলে নিল এবার।

লেখকের অন্যান্য বই

ছোটগল্প

অসমতল

হলদে বাড়ি

উল্টোরথ

পতাকা

চড়াই-উৎরাই

শ্রেষ্ঠ গল্প

উপন্যাস

অক্ষরে অক্ষরে

দেহমন

দূরভাষিণী